ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

জানুয়ারি ২০২০ | উন্নয়নমূলক মাসিকপত্রিকা | ₹ ২২

পরিবেশ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

UNFCCC-এর ২৫তম অধিবেশনে ভারত

বিশেষ নিবন্ধ

কায়াকল্প : জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রের রূপান্তর
প্রীতি সুদন

শহরে সুষ্ঠু ও সুস্থায়ী সাফাই ব্যবস্থা
দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

সাক্ষাৎ কার

অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথন

ফোকাস

জল ব্যবস্থাপনা : এক মজবুত দেশ গঠনের প্রথম শর্ত
ইউনিসেফ WASH গোষ্ঠী

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী

১৩০ কোটি ভারতীয়র প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ৭৪তম অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।

মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে দেশবাসীর জন্য ১১ কোটি শৌচালয় গড়ে যখন কোনও উন্নয়নশীল দেশ বিশ্বের বৃহত্তম স্যানিটেশন অভিযানে সাফল্য অর্জন করে, তখন তার সেই প্রচেষ্টার কৃতিত্ব ও সুফল সারা দুনিয়ার কাছে অনুপ্রেরণার বার্তাবহ।

৫০ কোটি মানুষকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাইয়ে দিয়ে যখন কোনও উন্নয়নশীল দেশ বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালিয়ে সাফল্য অর্জন করে, তখন সেই প্রকল্পের সুফল ও কৃতিত্ব বিশ্বকে এক নতুন পথ দেখায়।

আজ আসার সময়, এখানকার প্রবেশদ্বারের কাছে লক্ষ্য করলাম যে দেওয়ালে একটি সাইনবোর্ডে লেখা আছে ''শুধু একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আর নয়''। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভাকে আমি সানন্দে একথা জানাতে চাই যে আমার এই ভাষণ চলাকালীনই সারা দেশজুড়ে এক বিশাল বড়ো অভিযান চলছে যাতে ভারতকে ''শুধু একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক''-মুক্ত করা যায়।

আগামী পাঁচ বছরে জল সংরক্ষণের প্রসারের পাশাপাশি আমরা ১৫ কোটি পরিবারের কাছে জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করব। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার কিলোমিটারের নতুন রাস্তা গড়ব। ২০২২ সালে ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। তার আগেই দরিদ্রদের জন্য ২ কোটি বাড়ি বানানোর কথা আমরা ভেবেছি। যক্ষ্মা নির্মূলীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন সময়সীমা ২০৩০ হলেও, আমরা ভারতকে ২০২৫ সালের মধ্যেই যক্ষ্মামুক্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

প্রায় তিন হাজার বছর আগে, ভারতের এক মহান কবি, কারিয়ান পুনগুন-দ্রা-নার বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ভাষা তামিলে লেখেন ''ইয়া-দম, উ-রে, ইয়াভে-রাম, কে-রির'', যার অর্থ, ''আমরা সব জায়গার এবং সকলের''। সীমান্ত নির্বিশেষে এই হৃদ্যতা ভারতের অনন্য ঐতিহ্য।

গত পাঁচ বছরে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই ভারত নিজের শতাব্দী প্রাচীন মহান ঐতিহ্য বজায় রেখে অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিত্রতা তথা বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে। গম্ভীর আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে যে বিষয়সমূহ ভারত উত্থাপন করেছে, এগিয়ে এসে যে ধরনের নতুন বিশ্ব মঞ্চ গড়ে তুলেছে, তার জন্য প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তথা মাথাপিছু হিসাবের নিরিখে বিশ্ব উষ্ণায়নে ভারতের অবদান অতি সামান্য। তা সত্ত্বেও বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রশমনে সচেষ্ট প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ভারত। একদিকে, আমরা ৪৫০ গিগা-ওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির লক্ষ্য অর্জন করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি; অন্যদিকে, আমরা ''আন্তর্জাতিক সৌর জোট'' গড়ার ক্ষেত্রেও উদ্যোগী হয়েছি। বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম প্রভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতায় বৃদ্ধির পাশাপাশি নিত্যনতুন জায়গায় এবং নতুন নতুন কায়দায় এর আবির্ভাব। এই প্রেক্ষিতেই ভারত ''প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহনীয় পরিকাঠামোর জন্য জোট'' গড়তে তোড়জোড় শুরু করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় টিঁকে থাকবে এমন পরিকাঠামো গড়ে তুলবে এই জোট।

আজ পৃথিবী বদলে গেছে। একুশ শতকের আধুনিক প্রযুক্তি আমূল পরিবর্তন এনেছে সমাজ, ব্যক্তিগত জীবন, অর্থনীতি, সুরক্ষা, যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে। গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখার দিন শেষ। এই নতুন যুগে আমাদের নয়া দিশা ও নব উদ্যম দিতে হবে বহুপাক্ষিকতা ও রাষ্ট্রপুঞ্জকে।

''সংহতি ও শান্তি...বিভেদ নয়''—একশ পঁচিশ বছর আগে, মহান আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে এই বার্তাই দিয়েছিলেন।

আজ, বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে ''সংহতি ও শান্তি''-র সেই একই বার্তা দিচ্ছে।

(২০১৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার উদ্ধৃতাংশ)

(সূত্র প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো)

জানুয়ারি, ২০২০

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেন্দ্র চৌধুরী**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- UNFCCC-এর ২৫তম অধিবেশনে ভারত — যোজনা ব্যুরো — ৫
- জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয় মোকাবিলায় কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকা — নুটি নমিতা — ৯
- কার্বন নিঃসরণ কমাতে পশ্চিমঘাটের অবদান — টি. ভি. রামচন্দ্র, ভরত সেতুর, বিনয় এস. ভরত এইচ. আইথল — ১২
- কৃষিক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের উদ্যোগ — চন্দ্রশেখর রাও নুথালাপাতি — ১৬
- বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা — মঞ্জুলা ওয়াধাওয়া — ২০
- উন্নয়ন ও পরিবেশ : ভারসাম্যের লক্ষ্যে — এস. সি. লাহিড়ী — ২৪
- ইমারত ও সড়ক নির্মাণে বর্জ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার — অশোক জি. মাতানি — ২৮

সাক্ষাৎকার

- একান্ত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথন — যোজনা ব্যুরো — ৩২

বিশেষ নিবন্ধ

- কায়াকল্প : জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রের রূপান্তর — প্রীতি সুদন — ৩৬
- শহরে সুষ্ঠু ও সুস্থায়ী সাফাই ব্যবস্থা — দুর্গাশঙ্কর মিশ্র — ৩৯

ফোকাস

- জল ব্যবস্থাপনা : এক মজবুত দেশ গঠনের প্রথম শর্ত — ইউনিসেফ WASH গোষ্ঠী — ৪৬

অন্যান্য নিবন্ধ

- আরও শক্তিশালী গণতন্ত্রের লক্ষ্যে নির্বাচনী সাক্ষরতা — উমেশ সিনহা — ৫৫

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৫৭
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৫৮
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৫৯
- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো — ৭০
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

কাজে নামার সময় সমাগত

বাতাসের গুণগত মান প্রায়শই মারাত্মক বিপজ্জনক স্তর ছুঁয়ে ফেলছে। ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ যে কলুষিত, তা আজ এক নির্মম সত্য। জল স্তর ক্রমশ নিচে নামছে। সমুদ্রের জল স্তর বাড়ছে, যানবাহন ও শিল্প-কারখানা বাতাসকে উত্তরোত্তর দূষিত করে চলেছে। প্লাস্টিক বর্জ্য গোটা বাস্তুতন্ত্রকেই বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের নগর-শহরগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠছে ভাগাড়-ভূমি।

আমাদের আশপাশের পরিবেশে এইসব অবনমনের চিহ্ন অতি প্রকট রূপ ধারণ করেছে, যা কিনা প্রতিটি মানুষের জীবনের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। ঘন ঘন বন্যা ও খরার প্রাদুর্ভাব, আচমকা আবহাওয়া চক্র ও শস্য বপনের ধরনে পরিবর্তন, ক্রমহ্রাসমান উপকূলীয় অঞ্চল এমনই কয়েকটি উদাহরণ; যা গোটা মনুষ্যজাতির অস্তিত্বের সামনে লাল ঝাণ্ডাস্বরূপ।

দশকের পর দশক ধরে পরিবেশের এই অবক্ষয় কালক্রমে, আমরা যে বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, সেই গোটা বাস্তুতন্ত্রকেই সংকটাপন্ন করে তুলেছে। মানুষকে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে আপোশ করতে হচ্ছে; স্বাস্থ্যের উপর হানিকর প্রভাব পড়ছে; এবং সর্বোপরি তা বৃদ্ধি এবং বিকাশের চালু মডেলগুলির বাস্তব কার্যকারিতাকেই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। সুস্থায়ীত্ব এবং বিকাশকে এগোতে হবে হাতে হাত মিলিয়ে। আজ যে বর্জ্য-আবর্জনা আমাদের কর্মকাণ্ডের দরুন তৈরি হচ্ছে, তা সঠিক পন্থা মেনে অপসারণ করা না হলে, পরিবেশের পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। আমরা বছরের পর বছর ধরে, ব্যবহার করেই ছুঁড়ে ফেলে বর্জ্যের পাহাড় গড়ার যে সংস্কৃতি অনুসরণ করে আসছি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সামগ্রী। পরিবেশকে অবলম্বন করে ডালপালা মেলেছে এক ধরনের অর্থনীতি; এবং অবশ্যই পাশাপাশি আছে সাধারণ অর্থনীতি। এই উভয় ধরনের অর্থনীতিই জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রশমনের দ্বারা প্রভাবিত। বিষয়টি একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ খাড়া করে, অন্যদিকে খুলে দেয় সুপ্ত সুযোগের দুয়ার।

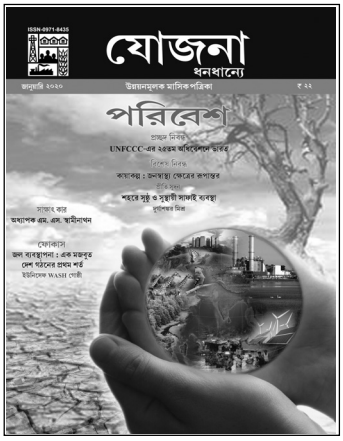

যে ফসল বপন করা হয়, সেই ফসলই কাটতে হয়, এই আপ্তবাক্যের সার্থক উদাহরণ পরিবেশ। আমাদের সম্মিলিত কার্যকলাপ প্রভাব ফেলে পরিবেশের উপর। ঠিক তেমনই, জলবায়ু পরিবর্তনের ফল ভুগতে হয় ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষকে। সম্প্রতি স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত United Nations Framework Convention on Climate Change-এর আওতায় প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের বহুপাক্ষিক সম্মেলনে (UNFCC COP 25); এতকাল ধরে পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনগুলির আসরে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলাপ-আলোচনার চালু রীতি পরিত্যাগ করে একে সুযোগ হিসাবে কাজে লাগানোর রাস্তা খোঁজা হয়। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে গোটা বিশ্বকে একত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিবেশগত ইস্যুগুলির সমাধানে প্রতি ভারত বরাবরই দায়বদ্ধতা দেখিয়ে এসেছে; অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। পুনঃব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনে প্যারিস চুক্তিতে বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই হোক; বা বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের চল বৃদ্ধি তথা যানবাহন নিঃসৃত প্রদূষণ বিধি মেনে চলা হোক; অথবা আন্তর্জাতিক সৌর জোট তথা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহনীয় পরিকাঠামোর জন্য জোট হোক, ভারত সদাসর্বদা সামনের সারিতে থেকে উদাহরণ পেশ করেছে।

যোজনা পত্রিকার এই সংখ্যাটিতে পরিবেশ সম্পর্কিত ইস্যুগুলির বিশদ বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। আমরা সৌভাগ্যবান যে অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথনের মতো এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার এই সংখ্যায় প্রকাশ করতে পেরেছি। ১৯৬০-এর দশক থেকেই সুস্থায়ী কৃষিকাজের প্রসার ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে তার মূল্যবান মতামত সমৃদ্ধ নিবন্ধসমূহ যোজনার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে আসছে।

পরিবেশে বর্তমানে বিপদ সীমান্তে উপনীত। আগামী প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে একসাথে কাজ করাটা আমাদের সংঘবদ্ধ দায়ভারের মধ্যে পড়ে। জীবনশৈলী, যা কিনা স্বয়ং-সুস্থায়ী; সকলের জন্য পর্যাপ্ত সহায়সম্পদ; বাস্তুতন্ত্রের অবনমনের মূল্যে বিকাশ নয়; গাছপালা-পশুপাখি-বন্যপ্রাণ নিরাপদ হাতে থাকবে; জল-জমি-বাতাস মানুষ তথা প্রাণের অন্যান্য উদাহরণের পক্ষে যথাযথ; ইত্যাদি সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কিছু বৈশিষ্ট্য।

গান্ধীজী তাঁর দূরদৃষ্টি থেকে একটা কথা বলেছিলেন, যার মর্মার্থ, ''প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট সম্পদ বিশ্বের ভাণ্ডারে অবশ্যই আছে; কিন্তু প্রত্যেকের লোভ মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়''। কথাটি ফের স্মরণ করিয়ে দিতেই প্রকাশ করা হল যোজনার বিশেষ এই পরিবেশ সংখ্যাটি। সেই মতো কাজে নামার সময় সমাগত।❑

UNFCCC-এর ২৫তম অধিবেশনে ভারত

আজ আয়নায় আমাদের নিজেদের মুখ দেখতে হবে। উন্নত দুনিয়া কি তাদের নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছে? দুর্ভাগ্যবশত, উন্নত দেশগুলি (অ্যানেক্সড কান্ট্রিজ) কিয়োটো প্রোটোকলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেনি। এই প্রতিশ্রুতি পালনের কোনও সদিচ্ছার প্রতিফলন তাদের NDC-তে নেই। প্রাক্-২০২০ সময়কালের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা পূরণের জন্য এখনও তিন বছর সময় আছে। ততদিনে নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের মধ্যে কতটা ফারাক রয়েছে তা নির্ধারণ করা যাবে।

স্পেনের মাদ্রিদে গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো চুক্তির (UNFCCC) অংশীদার দেশগুলির ২৫তম বৈঠকে (COP-25) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা তথ্য ও সম্প্রচার এবং ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। এই বৈঠকে তার ভাষণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

মাননীয়া সভাপতি মহাশয়া ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

মহাত্মা গান্ধীর একটি কথা উদ্ধৃত করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই। তিনি বলেছিলেন...'আমরা আজ যা করছি তার ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের আগামী কাল'।

এত অল্প সময়ের মধ্যে সর্বাঙ্গসুন্দর এই বৈঠক আয়োজনের জন্য আমি স্পেন সরকারকে সাধুবাদ দিতে চাই। চিলির সভাপতিত্বে এই বৈঠককে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তব সমস্যা। এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই প্যারিসে একটি সর্বাত্মক চুক্তি গ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক মহল। লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে আসুন, এবার আমরা এই চুক্তি রূপায়ণে সচেষ্ট হই। জলবায়ু পরিবর্তন যদিও বা একটা অপ্রিয় সত্য, কিন্তু এর সমাধানে আমরা সুবিধাজনক কর্মপরিকল্পনা পেশ করেছি। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে এগোচ্ছি।

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ওপর GDP-এর নির্ভরতা ২১ শতাংশ কমিয়েছে ভারত। প্যারিসে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এই নির্ভরতা কমিয়ে ৩৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার পথে এগোচ্ছে আমাদের দেশ।

প্যারিস চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৭৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আমরা ইতোমধ্যেই ৮৩ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে সমর্থ্য হয়েছি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ৪৫০ গিগাওয়াট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সৌরশক্তি, বায়োমাস ও বায়ু শক্তিকে আমরা যথাসম্ভব কাজে লাগাচ্ছি।

কয়লা উৎপাদনের ওপর আমরা কার্বন ট্যাক্স বসিয়েছি, যার হার টনপিছু ৬ ডলার। আমাদের পার্লামেন্টে ৩৬-টি দলের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও সর্বসম্মতিক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

একশো শতাংশ জৈব জ্বালানি-নির্ভর বাণিজ্যিক উড়ানের কথা আমরা শুনেছি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানোর লক্ষ্য আমরা নিয়েছি। যানবাহনের নিঃসরণ মাত্রার ক্ষেত্রে ভারত স্ট্যান্ডার্ড iv-এর পরিবর্তে ভারত স্ট্যান্ডার্ড vi চালু করা হয়েছে। ২০২০ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে সমস্ত যানবাহন ভারত স্ট্যান্ডার্ড vi মেনে চলবে।

UNFCCC-২৫-এ BASIC রাষ্ট্রগুলির মন্ত্রীদের যৌথ বিবৃতি

স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো চুক্তির অংশীদার দেশগুলির ২৫তম বৈঠকে (COP-25) BASIC রাষ্ট্রগুলির মন্ত্রীদের যৌথ বিবৃতির সারাংশ।

১। স্পেনের মাদ্রিদে গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো চুক্তির অংশীদার দেশগুলির ২৫তম বৈঠকে (COP-25) ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও চিনকে নিয়ে গঠিত BASIC গোষ্ঠীর মন্ত্রীরা মিলিত হয়েছেন। এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের পরিবেশ বিষয়ক ভাইস মিনিস্টার ঝাও ইংমিন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিলের পরিবেশ মন্ত্রী রিকার্ডো সালেস, দক্ষিণ আফ্রিকার বন, মৎসচাষ ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী বারবারা ক্রিসি ও ভারতের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা তথ্য ও সম্প্রচার এবং ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বিষয়ক মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

২। চিলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অংশীদার দেশগুলির ২৫তম বৈঠকে (COP-25) নিজেদের পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মন্ত্রীরা। এই বৈঠক আয়োজনের জন্য স্পেন সরকারকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তারা। তারা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ২০২০ পরবর্তী পর্বে প্যারিস চুক্তির পূর্ণ রূপায়ণের পথনির্দেশিকার জন্যই এই COP-25-এর আয়োজন এবং UNFCCC ও এর অন্তর্গত প্রোটোকলের আওতাতেই জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি নিতে হবে।

তারা বলেছেন যে, প্রাক্-২০২০ পর্বের জন্য যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার অগ্রগতির ওপরই নির্ভর করছে এই COP-25-এর সাফল্য। সম্মিলিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক মহলকে শামিল করার জন্য বহুপাক্ষিকতার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো চুক্তির (UNFCCC) আওতায় সম্পাদিত প্যারিস চুক্তি একটা মাইল ফলক। এই সাফল্যকে ধরে রাখতে হবে এবং এর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া প্যারিস চুক্তির সর্বাত্মক ও যথাযথ রূপায়ণের জন্য আন্তর্জাতিক মহলকে শামিল করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন মন্ত্রীরা। সেইসঙ্গে চুক্তির লক্ষ্য ও নীতিগুলির ওপর নজর দেওয়ার কথাও তারা বলেছেন। প্রসঙ্গত, চুক্তির অন্যতম নীতি হল সমতা রক্ষা। বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিন্ন কিন্তু পৃথক পৃথক দায়িত্বের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই চুক্তির রূপায়ণ ঘটাতে হবে।

৩। COP-25-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছেন মন্ত্রীরা।

(ক) প্যারিস চুক্তির ৬ নং ধারা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ করা।

(খ) প্রাক্-২০২০ জন্য যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা রূপায়ণে কতটা অগ্রগতি হয়েছে, কতটাই বা খামতি রয়ে গেছে তার মূল্যায়ন তথা এই খামতিগুলি পূরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য SBI-এর আওতায় দুই বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি গ্রহণ।

(গ) উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তাদান, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও তা হস্তান্তর তথা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত দেশগুলি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ওপর চাপ বাড়ানো।

(ঘ) সর্বাত্মক ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্যারিস চুক্তির ধারাগুলিকে ব্যাখ্যা করা ও সেগুলির রূপায়ণ ঘটানো।

৪। প্যারিস চুক্তিতে যে লক্ষ্য ও নীতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সেই অনুসারে এই চুক্তির ৬ নং ধারা সংক্রান্ত যাবতীয় আলাপ-আলোচনা সম্পন্ন করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করে এই আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণের ওপরও জোর দিয়েছেন তারা। ৬.২ ও ৬.৪ ধারার আওতায় যে ব্যবস্থাপত্রগুলির কথা রয়েছে সেগুলির মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার ওপরও তারা জোর দিয়েছেন। বলেছেন, ৬.২ নং ধারা ও ৬.৪ নং ধারার আওতায় সংগৃহীত অর্থ অ্যাডাপটেশন ফান্ডে জমা দেওয়ার যে বিধান রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই ধারা অন্তর্গত ব্যবস্থাপত্রগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। ৬ নং ধারার সঠিক পরিচালনা ও দূষণমুক্ত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বা ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম থেকে মসৃণভাবে উত্তরণের জন্য এই ধারা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত রূপায়িত হলে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনার সংহতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা যাবে এবং সেইসঙ্গে এই চুক্তির লক্ষ্যগুলি পূরণে বেসরকারি ক্ষেত্রের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে তাদের কাছে একটা কড়া বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে। একতরফা ও বৈষম্যমূলক যে পদক্ষেপের ফলে বাজারে অসাম্য দেখা দিতে পারে বা অংশীদার দেশগুলির মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে সেসব পদক্ষেপ এড়িয়ে চলতে হবে।

৫। উন্নয়নের নিরিখে প্যারিস চুক্তির অংশীদার দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং দেশগুলির রাজনৈতিক অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন। এই সব দিকে নজরে রেখে এই চুক্তিতে ১৯৫-টি অংশীদার দেশের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে সেকথা স্মরণ করে বর্তমানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় যে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিচ্ছে তার প্রতি গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রীরা। প্রাক্-২০২০ কর্মসূচির তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তেমন অগ্রগতি হয়নি। আর্থিক সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তাদানের মতো বিষয়গুলির ওপর তেমন নজর দেওয়া হচ্ছে

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

না। অথচ জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে বিশ্বের দেশগুলির সম্মিলিত প্রয়াসে নিজেদের অবদান রাখার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির এই সহায়তা প্রয়োজন। প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যগুলি পূরণ এবং আজকের এই সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য এই ভারসাম্যহীনতাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

৬। মন্ত্রীরা তাদের বিবৃতিতে একথা জোর দিয়ে বলেছেন যে অংশীদার দেশগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা দেখেই তাদের সদিচ্ছা বোঝা যাবে। প্রাক্-২০২০ সময়কালের জন্য উন্নত দেশগুলি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা তাদের রক্ষা করতে হবে। কারণ ২০২০ পরবর্তী সময়কালের কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণের ভিত্তি তৈরি করতে তথা পারস্পরিক আস্থা গড়ে তুলতে প্রাক্-২০২০ কর্মপরিকল্পনার সম্পূর্ণ রূপায়ণ একান্ত প্রয়োজন। প্রাক্-২০২০ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যথাসম্ভব কমানো, তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের পদ্ধতিতে যে খামতি রয়ে গেছে সেগুলি মূল্যায়ন করে উন্নত দুনিয়াকে তা পূরণ করতে হবে। এজন্য উন্নয়নশীল দুনিয়ার ওপর কোনও বোঝা চাপানো চলবে না। প্রাক্-২০২০ কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে খামতিগুলো রয়েছে সেগুলি পূরণ করা হলে তবেই প্রাক্-২০২০ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তার যে প্রতিশ্রুতি উন্নত দুনিয়া দিয়েছে তা পূরণের ওপরই পরবর্তী আলোচনা নির্ভর করছে।

৭। এই চুক্তির আওতায় যে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলি নেওয়া হয়েছে তা পূরণে সামগ্রিকভাবে কতটা অগ্রগতি হল তার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটি পর্যালোচনার ওপর জোর দিয়েছেন মন্ত্রীরা। UNFCCC-এর আওতায় এই পর্যালোচনা ব্যবস্থার একটা নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী থাকবে এবং এই ব্যবস্থাই জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসাবে এই চুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রাক্-২০২০ কর্মপরকল্পনায় দুই বছর অন্তর যে পর্যালোচনার বিধান রয়েছে তার থেকে একটু আলাদা হবে এই নতুন পর্যালোচনা ব্যবস্থা। কারণ প্রাক্-২০২০ 'ওয়ার্ক প্রোগ্রাম ও গ্লোবাল স্টকটেক'-এর পদ্ধতির আলাদা কারিগরি দিক রয়েছে যার সঙ্গে এই নতুন প্রস্তাবিত পর্যালোচনা ব্যবস্থা মানানসই হবে না। এই নতুন পর্যালোচনা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। এতে একই কাজের পুনরাবৃত্তি এড়ানো যাবে। প্রাক্-২০২০ ওয়ার্ক প্রোগ্রামে দু'-বছর অন্তর যে পর্যালোচনার ব্যবস্থা রয়েছে তার ফলাফলকে এই নতুন পর্যালোচনা ব্যবস্থায় কাজে লাগানো যেতে পারে। দুই ব্যবস্থা একসঙ্গে অনেক বেশি কার্যকরী হবে।

৮। মন্ত্রীরা এও জানিয়েছেন যে, BASIC দেশগুলি নিজেদের জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং তার রূপায়ণে যথেষ্ট অগ্রগতিও হচ্ছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলের লড়াই আরও জোরদার হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা তথা পরিবেশ রক্ষার মতো যে চ্যালেঞ্জগুলি এই BASIC দেশগুলির কাছে রয়েছে সেগুলি সত্ত্বেও এই দেশগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে হাঁটছে। তার জন্য বিকাশের গতি বাধাপ্রাপ্ত হলেও এই দেশগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেনি। ২০০৫ সালে GDP-র প্রতি ইউনিটে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের যে মাত্রা ছিল, ২০১৮ সালে তার তুলনায় নিঃসরণ মাত্রা ৪৫.৮ কমিয়ে এনেছে চিন। সেইসঙ্গে প্রাথমিক শক্তির চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রেও জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়া অন্যান্য জ্বালানির পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৪.৩ শতাংশ। কার্বন কর চালু করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দেশের সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় একটি ব্যাপক পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৪ সালে কার্বন নিঃসরণের ওপর GDP-র নির্ভরতা ২০০৫ সালের তুলনায় ২১ শতাংশ কমিয়েছে ভারত। প্রাক্-২০২০ সময়কালের জন্য স্বেচ্ছায় নিজেদের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা ভারত রেখেছিল, তা পূরণ করা হয়েছে। ব্রাজিলও পিছিয়ে নেই। নিজেদের NAMA (নন-এগ্রিকালচারাল মার্কেট অ্যাকসেস)-তে যে সমস্ত কর্মসূচির কথা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসরণ মাত্রা ৫৮ শতাংশ কমিয়েছে ব্রাজিল এবং এর মাধ্যমে ২০২০ সালের জন্য নির্ধারিত ৩৬-৩৯ শতাংশ নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ করেছে। BASIC দেশগুলি ইতোমধ্যেই পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছে এবং তা রূপায়ণের পথে এগোচ্ছে। ঐতিহাসিক দায়িত্বের ঊর্ধ্বে উঠে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আমরা আমাদের যথাসাধ্য করছি। এবার অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের। পরের বছর বা তারও পরের বছরের জন্য ফেলে রাখলে চলবে না।

সূত্র : *প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো*

দেশের ঘরবাড়িগুলিতে ৩৬ কোটি LED বালব্ বসানো হয়েছে। রাস্তায় প্রথাগত বাতির বদলে ১ কোটি LED আলো বসানো হয়েছে। নীতিগত হস্তক্ষেপ ও উৎসাহদানমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন যানবাহন চালু করার জোরদার প্রচেষ্টা চলছে। সাধারণ কাঠের চুল্লির বদলে এলপিজি ব্যবহারের ওপর আমরা জোর দিয়েছি। এই লক্ষ্যে ৮ কোটি এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পরিবেশের ক্ষতি না করে ঘরবাড়ি, কারখানায় শীতল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যে কুলিং অ্যাকশন প্ল্যান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যে অ্যাডাপটেশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছে আশানুরূপভাবেই সেগুলির অগ্রগতি হচ্ছে এবং এই দু'টি ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমাদের লক্ষ্যপূরণ করব।

বনসৃজনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে অতিরিক্ত ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টন কার্বন সমতুল শোষণের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি। গত পাঁচ বছরে দেশে বনাঞ্চলের আয়তন বেড়েছে

১৫ হাজার বর্গকিলোমিটার। শহরে বনাঞ্চল তৈরি, বিদ্যালয়গুলিতে নার্সারি গড়ে তোলা, কৃষিকাজের অঙ্গ হিসাবে বনসৃজন বা অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি তথা বনাঞ্চলে জল ও পশুখাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আমরা বিশেষ বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ওপরই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে ভারত। তাই জল সংরক্ষণে ভারত ৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। দিল্লিতে রাষ্ট্রসংঘের মরুকরণ (ডেসার্টিফিকেশন) প্রতিরোধ সংক্রান্ত চুক্তির অংশীদার দেশগুলির ১৪তম বৈঠকে ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে **২ কোটি ২৬ লক্ষ** (হেক্টর) পতিত জমির পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছিল। স্থলভূমিতে কার্বন সিংক (বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন শোষণের ব্যবস্থা) সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো কর্মসূচিগুলির মধ্যে অন্যতম। ইউরিয়া সারে ১০০ শতাংশ নিমের প্রলেপ ব্যবহারের পদ্ধতি সারা দুনিয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ১৭ কোটি সয়েল হেল্‌থ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এইভাবেই আরও বেশি পরিমাণে কার্বন সিংক তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় মোকাবিলার উপযোগী পরিকাঠামোর জন্য একটি জোট (কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার) গঠন করেছি আমরা। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মূল লক্ষ্যই হল বিভিন্ন বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়।

প্যারিসে বিভিন্ন দেশ যে NDC বা জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছিল তা পূরণের পথে মাত্র ছয়টি দেশই এগোতে পেরেছে এবং ভারত তার মধ্যে অন্যতম। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে জীবনযাপন ভারতের ঐতিহ্য।

আজ যখন আমরা প্রাক্-২০২০ সময়কালের শেষলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি তখন আত্মসমালোচনা ও নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন। আজ আয়নায় আমাদের নিজেদের মুখ দেখতে হবে। উন্নত দুনিয়া কি তাদের নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছে? দুর্ভাগ্যবশত, উন্নত দেশগুলি (অ্যানেক্সড কান্ট্রিজ) কিয়োটো প্রোটোকলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেনি। এই প্রতিশ্রুতি পালনের কোনও সদিচ্ছার প্রতিফলন তাদের NDC-তে নেই। প্রাক্-২০২০ সময়কালের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা পূরণের জন্য এখনও তিন বছর সময় আছে। ততদিনে নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের মধ্যে কতটা ফারাক রয়েছে তা নির্ধারণ করা যাবে।

এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই...সেটা হল অর্থের সংস্থান। গত দশ বছরে ১ লক্ষ কোটি ডলার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল উন্নত দেশগুলি। কিন্তু এই অর্থের ২ শতাংশও তারা দেয়নি। এই সহায়তার অর্থ সরাসরি সরকারের কাছ থেকে আসবে এবং এখানে কোনও ডবল অ্যাকাউন্টিং বা তৃতীয় পক্ষের হাত দিয়ে অর্থ ঢালার সুযোগ নেই। যথেচ্ছ কার্বন নিঃসরণের সুযোগ নিয়ে যে দেশগুলি আজ উন্নত দেশের তকমা পেয়েছে তাদের তো কিছুটা দায় নিতেই হবে।

উন্নয়নশীল দুনিয়ার কাছে এখন দু'টি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ : প্রযুক্তির বিকাশ এবং সুলভ মূল্যে তা হস্তান্তর। আমরা এখন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। এই অবস্থায় কাউকে মুনাফা লুটতে দেওয়া যাবে না। তাই আমাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য আরও বেশি করে যৌথ গবেষণা ও সহযোগিতা গড়ে তোলা তথা সম্মিলিত অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব দিচ্ছি আমি।

পরিচ্ছন্ন, দূষণমুক্ত, সবুজ ও স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ে তোলার পথে অংশীদার দেশগুলির এই ২৫তম সম্মেলন এক ধাপ এগিয়ে দেবে। বাজার ও বাজার-বহির্ভূত ব্যবস্থাপনাগুলিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিয়োটো প্রোটোকলের আওতায় দূষণমুক্ত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় (ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম) উত্তরণ এবং যে বেসরকারি সংস্থাগুলি এই লক্ষ্যে বিনিয়োগ করেছে তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ৬ ধারায় উল্লিখিত নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলা হবে বলে আমরা আশা রাখছি।

বিশ্বজুড়ে বিপন্ন জনগোষ্ঠীগুলির স্বার্থে ওয়ারশ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার (ওয়ারশ ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজম ফর লস অ্যান্ড ড্যামেজ) কঠোর রূপায়ণ প্রয়োজন এবং এই ব্যবস্থাপনায় আর্থিক সহায়তাও সুনিশ্চিত করতে হবে।

এখন আমাদের সকলকে নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে এবং দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নিতে হবে। ভারত তার দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং সেইসঙ্গে আমরা এও আশা করব বহুপাক্ষিক মঞ্চগুলিও এই মর্মে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে এবং উন্নত দুনিয়া একাজে নেতৃত্ব দেবে।

থুরো-র একটা উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি...'বাড়ি দিয়ে কী হবে? এই গ্রহে যদি সেটা বানানোর উপযুক্ত পরিবেশই না থাকে!'❑

সূত্র : *প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো*

প্রকাশন বিভাগের যেকোনও পত্রিকা সম্বন্ধে অভিযোগ থাকলে helpdesk1.dpd@gmail.com-এ ই-মেল মারফত জানান। যোজনা (বাংলা)-র পাঠকরা subscription.yojanabengali@gmail.com-এও যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয় মোকাবিলায় কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকা

নুটি নমিতা

আঞ্চলিক তথ্যসমূহ স্থানীয় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সেরা মাধ্যম হল কমিউনিটি রেডিও। বিপর্যয় মোকাবিলা শিক্ষা, বিশেষত বিপর্যয়ের আগের প্রস্তুতি এবং বিপর্যয় চলার সময়ে করণীয় কর্তব্যের বিষয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতার প্রসারে কমিউনিটি রেডিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির মালিকানা, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে এক শক্তিশালী কমিউনিটি রেডিও আন্দোলন গড়ে তুলতে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মানুষের কাছে আরও বেশি তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের ক্ষমতায়ন এর লক্ষ্য।

যে সব বিষয় একটি কমিউনিটি বা গোষ্ঠীর জীবনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, কমিউনিটি রেডিও, তাদের সেই সব বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দেয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত সরকারি নীতি অনুসারে সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনকে উৎসাহ দিতে ২০০৬ সালের নভেম্বরে সরকার আর একটি নীতি প্রণয়ন করে, যার আওতায় অলাভজনক সংগঠনগুলিকেও কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন এই নীতি কমিউনিটি রেডিওকে উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মতপ্রকাশের মঞ্চ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমানে ভারতে ২৭৬-টি সচল কমিউনিটি রেডিও স্টেশন আছে। এর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ১২৯-টি এবং গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনগুলি ১৩২-টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। ১৫-টি চালায় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র/রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি। দেশে উপকূলবর্তী জেলার সংখ্যা ৭৮। কিন্তু সব উপকূলবর্তী জেলায় কমিউনিটি রেডিও স্টেশন নেই। বর্তমানে ২৬-টি জেলায় সচল রয়েছে ৫১-টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন। গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে নেপাল, বাংলাদেশ ও ফিলিপিনসেও কমিউনিটি রেডিওকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কমিউনিটি রেডিও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

রেখাচিত্র-১
বছরের ভিত্তিতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের সংখ্যাবৃদ্ধি

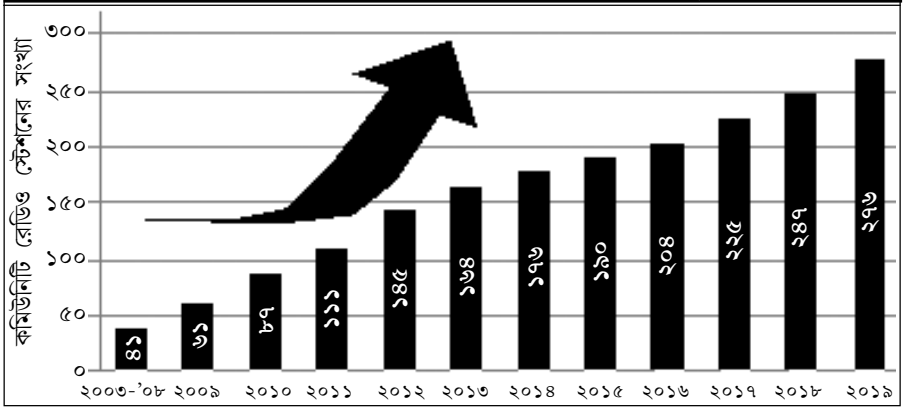

[লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসের শ্রী বেঙ্কটেশ্বর কলেজে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক। ই-মেল : namita.nuti@gmail.com]

জ্ঞানের বিস্তার ও সচেতনতা প্রসারের হাতিয়ার হিসাবে কমিউনিটি রেডিও যেসব সুযোগসুবিধা এনে দেয় তা হল :

- এতে গোষ্ঠীর নিজস্ব বাকরীতি ও ভাষায় কথা বলা হয়, ফলে স্থানীয় মানুষজন সহজেই বুঝতে পারেন।
- লিসনিং ক্লাব, কল ইন শো প্রভৃতির মাধ্যমে এতে দ্বিমুখী সামাজিক শিক্ষামূলক বার্তালাপ হয়।
- এর মাধ্যমে একটি গোষ্ঠীর চাহিদা, পছন্দ, দাবি, জ্ঞান প্রভৃতি সেই গোষ্ঠীর বাইরেও প্রবাহিত হয়, যা নীতি নির্ধারণ, গবেষণা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর কাজে লাগে।
- যেসব গোষ্ঠীর কাছে তথ্য ও জ্ঞান আদানপ্রদানের আর কোনও মাধ্যম নেই, তাদের একমাত্র সংবাদ মাধ্যম হিসাবে এটি কাজ করে।
- জীবিকা, গোষ্ঠী নেতা, সংগঠন, শাসন প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এই পক্ষগুলি প্রায়শই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কমিউনিটি রেডিও এবং বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা

বিপর্যয় মোকাবিলার প্রতিটি পর্যায়ে, অর্থাৎ পূর্বাভাস, প্রস্তুতি, সময় থাকতে সতর্কতা, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন, সব ক্ষেত্রেই কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বাসিন্দাদের মধ্যে তথ্য ও বার্তা আদানপ্রদান এবং গোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধি ও স্বশাসনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। তথ্যচিত্র, আলাপচারিতামূলক টক শো, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে গোষ্ঠীর মানুষজন জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিবর্তন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন।

কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে এখন আবহাওয়ার স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস, দুর্যোগের সতর্কতা, পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা প্রচারে জোর দেওয়া হয়। এগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এছাড়াও গোষ্ঠীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য ও জ্ঞান আদানপ্রদানে কমিউনিটি রেডিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। এতে স্থানীয় মানুষজন ও গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন হবে এবং স্থানীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বাড়বে।

সুযোগ

বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিও তিনটি পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

● **প্রাক্-বিপর্যয় পর্যায় :** বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি কীভাবে নিতে হবে, তার নীতিনির্দেশিকা এই পর্যায়ে কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলি থেকে প্রচার করা হয়। বিপর্যয়ের সময়ে মানুষ কোথায় জড়ো হবেন এবং নিরাপদ আশ্রয় কোথায় পাবেন, তার সন্ধান দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যবিধি ও প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য মানুষকে জানানো যেতে পারে। সেইসঙ্গে নিরাপত্তার মহড়া দেওয়া যায়, যাতে মানুষ আপৎকালীন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পেরে সেইমতো কাজ করতে পারেন। দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা প্রচার করা কমিউনিটি রেডিওর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেখানে অন্য কোনও প্রচারমাধ্যম পৌঁছতে পারে না, সেখানেও কমিউনিটি রেডিও পৌঁছতে পারে। শিক্ষাগত স্তরবিন্যাস ও অর্থনৈতিক বিভেদের বেড়া ঘুচিয়ে বিপর্যয়ের সময়ে মানুষকে এক জায়গায় আনতে পারে কমিউনিটি রেডিও।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু রেডিও সম্প্রচার অব্যাহত থাকতে পারে। অন্যান্য জায়গার দুর্যোগ মোকাবিলার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সহজ হয়। কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সর্বশেষ খবরাখবর প্রচার করা সম্ভব হয়।

● **বিপর্যয় চলাকালীন :** বিপর্যয় চলার সময়ে রেডিও সঙ্কেত ছাড়া যোগাযোগের প্রায় সব মাধ্যমই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে ত্রাণ সরবরাহকারী সংস্থাগুলি এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে গোষ্ঠীর মানুষজনের সংযোগ রক্ষা করা হয়। কমিউনিটি রেডিওর সবথেকে বড়ো দু'টি সুবিধা হল, এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর ওপর সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় এবং এর অনুষ্ঠান স্থানীয় ভাষায় সম্প্রচারিত হওয়ার ফলে গোষ্ঠীর মানুষজনের তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। এর মাধ্যমে উদ্ধারকার্য সম্পর্কিত তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে এক-একটি এলাকায় জানানো যায়। স্থানীয় ভাষায় তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় ভুল বোঝার কোনও অবকাশ থাকে না। দুর্যোগের বিপজ্জনক এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবার বিষয়ে কমিউনিটি রেডিও থেকে ঘোষণা করা যায়। বাসিন্দারা বুঝতে পারেন, কোথায় গেলে তারা নিরাপদ আশ্রয় ও

শুশ্রূষা পাবেন। স্থানীয় মানুষজন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ জেনে তাও প্রচার করা যায় কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে। মানুষ বুঝতে পারেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় আসলে কী ঘটছে।

● **বিপর্যয় পরবর্তী অধ্যায় :** এই পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুনর্বাসনের সময়েই একটি গোষ্ঠীর সবথেকে বেশি সহায়তার প্রয়োজন হয়। সেই সময়ে তাদের নিজেদের ভাষায় প্রয়োজনীয় তথ্য পেলে গোষ্ঠীর মানুষের মনোবল বাড়ে। বিপর্যয়ের বিভীষিকা কাটিয়ে ওঠার জন্য পরামর্শ এবং ত্রাণ সাহায্যের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য এই সময়ে কমিউনিটি রেডিও থেকে সম্প্রচার করা যেতে পারে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক নানা তথ্য পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে মানুষের কাছে। এইভাবে কমিউনিটি রেডিও উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অন্যতম অংশ হয়ে উঠতে পারে। এজন্য আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে কমিউনিটি রেডিও চালানোর প্রশিক্ষণ দিতে হবে, কীভাবে বিপর্যয়ের সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও খবর সম্প্রচার করতে হয়, তা শেখাতে হবে। তাহলে এক-একটি গোষ্ঠী নিজেরাই কমিউনিটি রেডিওর পরিকাঠামো ও তার ব্যবহার শিখে বিপর্যয় মোকাবিলায় দড় হয়ে উঠবে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় কমিউনিটি রেডিওর কর্মীদের প্রশিক্ষণ : এজন্য কমিউনিটি রেডিওর কর্মীদের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিপর্যয় প্রতিরোধ, তার মোকাবিলা এবং এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় তাদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রক ও দপ্তর এই কাজে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

উপসংহার

পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ এলাকাগুলিকে বারে বারেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। গ্রীষ্মের সময়ে দাবানল, বর্ষার সময়ে ভূমিধ্বস নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোষ্ঠীগুলিকে ক্রমাগত এইসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হয়। এক্ষেত্রে তাদের বিচ্ছিন্নতা সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে এইসব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ত্রাণ ও সাহায্যের খবর তাদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়। স্থানীয় ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার হওয়ায় ভাষাগত বিভ্রাটের আশঙ্কা নেই। বিপদের সময়ে মানুষ ভুল বুঝে বিভ্রান্ত হবেন না। কমিউনিটি রেডিওর ক্ষেত্রেও এখন নানা ধরনের প্রয়াস ও উদ্ভাবন চোখে পড়ছে। তবে তা যদি সংযুক্ত ও সার্বিকভাবে করা যায়, তাহলে এগুলির উদ্দেশ্য সার্থক হবে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনা

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

কার্বন নিঃসরণ কমাতে পশ্চিমঘাটের অবদান

টি. ভি. রামচন্দ্র
ভরত সেতুর, বিনয় এস.
ভরত এইচ. আইথল

ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে তার কার্বন নিঃসরণ ৩৩-৩৫ শতাংশ কমানোর জন্য প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এখনই তাই কার্বন শোষণের জন্য গাছাপালা শূন্য বা কম থাকা জায়গায় দেশি গাছগাছড়া লাগানোর কাজে নেমে পড়া দরকার। দরকার জমির ধরন (কোন অঞ্চলে কতটা বনজঙ্গল, জলাজমি, কৃষিজমি, পুকুর ইত্যাদি আছে) এবং তা ব্যবহার (Land Use Land Cover—LULC)-এর বিষয়ে বিধিনিষেধ ও তার প্রয়োগ। চাই টেঁকসই বিকল্প এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি বেশি করে উৎপাদনের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানো। এই নিবন্ধে বাস্তু সংস্থানের দিক থেকে সংবেদনশীল পশ্চিমঘাট এলাকা নিয়ে এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের কার্যাবলীর দরুণ পরিবেশ দূষণকারী গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ বাড়ার (প্রাক-শিল্প বিপ্লব কালে ২৮০ পিপিএম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ পিপিএম (Part Per Million) ফলে জলবায়ু বদলাচ্ছে, বাস্তুসংস্থানে উৎপাদনশীলতা ক্ষয় পাচ্ছে, জলের টানাটানি দেখা যাচ্ছে। আর এসবের মোদ্দাফল, মানুষের জীবন-জীবিকা মার খাচ্ছে। পেট্রল-ডিজেল-কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদন, চাষবাস, শিল্প, দূষিত জলাশয়ের মতো মনুষ্যকৃত কার্যকলাপ গ্রিন হাউস গ্যাস ছড়ানোর জন্য দায়ি। এই গ্যাসের মধ্যে ৭২ শতাংশই কার্বন ডাই-অক্সাইড। বাস্তুতন্ত্রের কাজকর্ম বহাল রাখতে গেলে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমনে ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। বনজঙ্গল কার্বন টেনে নেওয়ার সবচেয়ে বড়ো (প্রায় ৪৫ শতাংশ) হাতিয়ার, যা কিনা বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে সাহায্য করে।[১], [২]

অরণ্য হাসিল করে জমির ব্যবহার বেড়ে চলা এবং জমির উর্বরতা খোয়া যাওয়াটা বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল কারণ। কেননা এর ফলে যুগপৎ কার্বন শুষে নেওয়ার ক্ষমতা কমে এবং কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। এই অঞ্চলের ৩৬-টি বৃহত্তম ও বিপন্ন জীববৈচিত্র্য এলাকা এবং অরণ্যের অন্যতম পশ্চিমঘাট বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক জলবায়ু থিতু রাখতে সাহায্য করে। পশ্চিমঘাটে আছে ৪৬০০-টির বেশি প্রজাতির ফুলের গাছপালা (৩৮ শতাংশ বিপন্ন), ৩৩০-টি প্রজাতির প্রজাপতি (১১ শতাংশ বিপন্ন)। এখানে ডেরা ১৫৬-টি প্রজাতির সরীসৃপ (৬২ শতাংশ বিপন্ন) এবং ৫০৮ প্রজাতির পাখপাখালির (৪ শতাংশ বিপন্ন)। বাস করে ১২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী (১২ শতাংশ বিপন্ন), ২৮৯ প্রজাতির মাছ (৪১ শতাংশ বিপন্ন) আর ১৩৫ প্রজাতির উভচর জীব (৭৫ শতাংশ বিপন্ন)। অঞ্চলটির আয়তন ১,৬০,০০০ বর্গকিলোমিটারের মতো। কত না নদীনালা এবং লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমির জল নিকাশের সুবাদে একে বলা হয় ভারতের ওয়াটার টাওয়ার। দক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সাড়ে চব্বিশ কোটির বেশি লোকের খাদ্য এবং জলের নিরাপত্তাদার পশ্চিমঘাটের এসব নদীনালা। এখানে আছে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য, পর্ণমোচী বা শীতে পাতা ঝরা গাছের স্যাঁতসেঁতে বন, ঝাঁটি জঙ্গল, শোলা এবং সাবানা বা তৃণভূমি। বনাঞ্চলের ১০ শতাংশ আইনে আওতায় সুরক্ষিত।

ল্যান্ডস্যাট এইট অপারেশনাল ল্যান্ড ইমেজার (OLI-30 m resolution) ২০১৮-এর টেম্পোরাল রিমোট সেন্সিংয়ের তথ্যের সঙ্গে ফিল্ড এসটিমেশন এবং

[শ্রী রামচন্দ্র কো-অর্ডিনেটর, এনার্জি অ্যান্ড ওয়েন্টল্যান্ডস রিসার্চ গ্রুপ, সেন্টার ফর ইকলজিকাল সায়েন্সস টি ই ১৫। আহ্বায়ক, ইএনভিআই স্যাট সেন্টার ফর ইকলজিকাল সায়েন্সেস, আইআইএসসি। শ্রী সেতুর রিসার্চ স্কলার এবং শ্রী আইথল সহ-অধ্যাপক, আইআইটি খড়্গপুর। ই-মেল : tvr@iisc.ac.in; envis.ces@iisc.ac.in]

ইন্টারন্যাশনাল জিওস্ফিয়ার-বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম (IGPB) থেকে পাওয়া দশককালীন জমি ব্যবহার (১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০৫—১০০ এম রেজলুশন)-এর তথ্য সংযুক্তি মারফত জমি ব্যবহারের পরিবর্তন খতিয়ে দেখা হয়েছে। আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্যের মধ্যে ছিল পুদুচেরির ফ্রেঞ্চ ইন্সটিটিউটের তৈরি গাছপালার মানচিত্র (vegetation maps), সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ভূ-সংস্থান মানচিত্র (topographic maps) এবং ভার্চুয়াল আর্থ ডেটা (virtual earth data—Google Earth, Bhuvan)। স্ট্যান্ডার্ড বায়োম্যাস এক্সপেরিমেন্ট সংক্রান্ত প্রকাশিত লেখাজোখা এবং ট্রানসেক্ট-ভিত্তিক কোয়াড্রাট স্যাম্পলিং টেকনিক (tansect-based quadrat Sampling techniques) ব্যবহারের মাধ্যমে কর্ণাটকে পশ্চিমঘাট অরণ্যে ক্ষেত্র-ভিত্তিক পরিমাপনের তথ্যাদি জোগাড় করে বনের বাস্তুসংস্থানের কার্বন শুষে নেওয়ার ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছিল।[১], [২]

স্প্যাশিওটেমপোরাল জমি ব্যবহারের (spatiotemporal LU) বিশ্লেষণ জমিতে মানুষের কর্মকাণ্ডের চাপের দরুন বন ক্ষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৮৫ সালে অঞ্চলটিতে ১৬.২০ শতাংশ জমিতে চিরহরিৎ অরণ্য ছিল। তা ২০১৮-তে কমে দাঁড়ায় ১১.৩ শতাংশ। বাগিচা, কৃষি, খনি এবং বিল্ট-আপ (built-up) এলাকা ছিল যথাক্রমে ১৭.৯২ শতাংশ, ৩৭.৫৩ শতাংশ এবং ৪.৮৮ শতাংশ। জমি ব্যবহারে বদল আসার জন্য অ্যাকাশিয়া, ইউক্যালিপটাস, সেগুন এবং রবারের মতো একজাতের গাছের বাগিচা, উন্নয়ন প্রকল্প এবং কৃষিকাজ মূলত দায়ি। ১৯৮৫ থেকে ২০১৮ ইস্তক এই অঞ্চল হারিয়েছে ১২ শতাংশ লাগোয়া বনজঙ্গল। বনহীন এলাকার আয়তন বেড়েছে ১১ শতাংশ। লাগোয়া বনজঙ্গল (২০১৮ সালে ২৫ শতাংশ) সংরক্ষিত এলাকায় সীমাবদ্ধ। জমিতে মানুষের কাজকর্মের চাপ বাড়ায় বনের আশপাশের জমিজিরেতে গাছ লাগানো বাড়ছে। নির্বিচারে খনন কাজ চলায় গোয়াতে বহু লাগোয়া বনজঙ্গল লোপাট। ২০৩১ সালের সম্ভাব্য জমি ব্যবহারের ছক দেখাচ্ছে চিরহরিৎ বনের আয়তন কমবে, এর পাশাপাশি বাড়বে চাষবাসের আওতা (৩৯ শতাংশ) এবং বিল্ট-আপ এলাকা (৫ শতাংশ)।[১] পশ্চিমঘাটের পূর্ব কেরালা, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যে কৃষি ও বিল্ট-আপ এলাকায় বড়োসড়ো রদবদল হবে। ২০৩১ সাল নাগাদ পশ্চিমঘাটের মাত্র ১০ শতাংশে থাকবে চিরহরিৎ বনের আচ্ছাদন। ফলে জল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ হবে বিপন্ন।[৩], [৪] দাক্ষিণাত্যে মানুষের রুজিরুটির সুরক্ষা ব্যাহত হবে।

সামাজিক এবং বাস্তুসংস্থানের চাহিদা মেটাতে সবসময় জলের জোগান অব্যাহত রাখার জন্য তাই অববাহিকার ভূমিকা অপরিহার্য। দেশি প্রজাতির গাছপালা বেশি এমন অববাহিকায় নদীতে সব মরশুমে জল বয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে তা দিব্যি মালুম করা যায়।

কার্বন আত্তীকরণ

পশ্চিমঘাটের কার্বন শুষে নেওয়ার ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়েছে। এই পরিমাপ থেকে জানা গেছে যে, পশ্চিমঘাটের বনজঙ্গল বায়োম্যাস এবং কার্বন স্টকের এক অনন্য ভাঁড়ার।[১], [৫], [৬]

বায়ুমণ্ডলে কার্বন (মানুষের কাজকর্মের দরুন নির্গত) এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে বনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ[৪], [৫]। দক্ষিণ এবং মধ্য পশ্চিমঘাট অঞ্চলে দেশি গাছগাছড়ার বনের মাটি খুবই কার্বন (০.৪২ মেগা মিগাগ্রাম বা 0.42 m∈g) সমৃদ্ধ। পশ্চিমঘাটের কর্ণাটক এবং মধ্য কেরালায় প্রতি বছর কার্বন বাড়ছে বলে লক্ষ্য করা গেছে। কার্বন ক্ষয়কে বাদ দিয়ে উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে মোট কার্বন বৃদ্ধি ৩৭,৫০৭.৩ গিগা গ্রাম (37,507.3 Gg)। পশ্চিমঘাটে কার্বন শুষে নেওয়ার ক্ষমতায় সম্ভাব্য পরিবর্তনের এক হিসেব করা হয়েছে। জমির ব্যবহার পালটে যাওয়ার চলতি গতিপ্রকৃতি অনুসারে বাস্তুসংস্থানে বারোমাস ১.৩ মেগা গিগা গ্রাম, এর মধ্যে স্টোর্ড কার্বন (stored carbon) ০.৬৫ মেগা গিগা গ্রাম এবং মাটির কার্বন ০.৩৪ মেগা গিগা গ্রাম।

কার্বন নিঃসরণ

কার্বন ছড়ায় শক্তি ক্ষেত্র (৬৮ শতাংশ), কৃষি (১৯.৬ শতাংশ), কলকারখানা (৬ শতাংশ), জমি ব্যবহারের পরিবর্তন (৩.৮ শতাংশ) এবং বনজঙ্গল (১.৯ শতাংশ)। ভারতে ২০১৭ সালে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছড়ানোর পরিমাণ প্রায় ৩.১ মেগা গিগা গ্রাম এবং মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ ২.৫৬ টন। বড়ো বড়ো শহর ১.৩ মেগা গিগা গ্রামের কার্বন ছড়ায়। এর মধ্যে দিল্লির দায়ভাগ ৩৮,৬৩৩.২০ গিগা গ্রাম,

তার পর বৃহত্তর মুম্বাই (২২,৭৮৩.০৮ গিগা গ্রাম), চেন্নাই (২২,০৯০.৫৫ গিগা গ্রাম), বেঙ্গালুরু (১৯,৭৯৬.৬ গিগা গ্রাম), কলকাতা (১৪,৮১২.১ গিগা গ্রাম), হায়দরাবাদ (১৩,৭৩৪.৫৯ গিগা গ্রাম) এবং আমেদাবাদ (৬,৫৮০.৪ গিগা গ্রাম)। শক্তি, পরিবহণ, শিল্প, কৃষি, গবাদি পশুপালন এবং বর্জ্য থেকে প্রতি বছর এই কার্বন ছড়ায়।[৫]

বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে ভঙ্গুর পশ্চিমঘাট কার্বন নিঃসরণ কমাতে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। দক্ষিণ ভারতের সব ক'টি শহর থেকে নির্গত কার্বন এবং গোটা দেশের মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের ১.৬২ শতাংশ শুষে নেওয়ার ক্ষমতা সে ধরে। পশ্চিমঘাটের রাজ্যগুলি থেকে ছড়ানো কার্বনের মোট পরিমাণ ৩৫২৯২২.৩ গিগা গ্রাম (সারণি-১)। পশ্চিমঘাটের ক্ষমতা আছে এই নির্গমণের ১১ শতাংশ শুষে নেওয়ার। কার্বনের বাড়াবাড়ি রোখা এবং জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পশ্চিমঘাটের ভূমিকা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারত প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তিতে তার কার্বন নিঃসরণ ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৩-৩৫ শতাংশ কমানোর আশ্বাস দিয়েছে। আর কালবিলম্ব নয়, এখনই নেমে পড়া দরকার কার্বন শুষে নেওয়ার জন্য ন্যাড়া জমিতে দেশি প্রজাতির গাছপালা লাগানো, জমির ধরন ও তা ব্যবহারের বিধিনিয়ম রূপায়ণ এবং নবীকরণযোগ্য ও সুস্থায়ী বিকল্প শক্তির উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানোর জন্য। এই লক্ষ্যপূরণে, পরিবেশের দিক থেকে ঠুনকো অঞ্চলের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা চাই। চড়ামাত্রায় কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ি দূষণকারীকে দাওয়াই হিসেবে জরিমানা দিতে বাধ্য করতে হবে। এর পাশাপাশি, নিঃসরণ কমাতে চাই ইনসেনটিভ বা প্রণোদনা দেওয়া। কার্বন ব্যবসা দেখিয়ে দিয়েছে, টনপিছু ৩০ ডলার হিসেবে গ্রিন হাউস গ্যাস কমাতে ভারতের বনের আর্থিক সম্ভাবনা এবং পশ্চিমঘাটে অরণ্য বাস্তুতন্ত্রের মূল্য ১০,০০০ কোটি টাকা (১.৪ বিলিয়ন ডলার)। কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ মসৃণ হলে বন ধ্বংস অনেকখানি কমে যাবে এবং চাষিরা উৎসাহ পাবে গাছ লাগাতে ও জমিকে সেরা কাজে ব্যবহার করতে।[১-৪]

হতাবশিষ্ট দেশি গাছের বনের বেঁচে থাকার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জল নিরাপত্তা (বছরভর নাব্য নদীনালা) এবং খাদ্য নিরাপত্তার (জীববৈচিত্র্যের সুস্থায়িত্ব) জন্য তা একান্তই আবশ্যক। সব শেষ হয়ে যায়নি, খোয়া যাওয়া প্রাকৃতিক বনজঙ্গল আদি অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ এখনও আছে। তবে এজন্য চাই যথোপযুক্ত সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা।

সারণি-১
পশ্চিমঘাটের রাজ্যগুলিতে কার্বন নির্গমন

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	বছরে নির্গমন (গিগা গ্রাম)			প্রতি বছর	জাত	অপসারণ
	মিথেন-কার্বন-এর সমতুল	CO (কার্বন ডাই-অক্সাইড-CO_2-এর সমতুল)	কার্বন মনোক্সাইড CO (কার্বন ডাই-অক্সাইড-CO_2-এর সমতুল)	মোট (গিগা গ্রাম)	কার্বন	(শতাংশ)
গোয়া	২৩৩	৩৩৭	৩৮৮১	৪৪৫১	৮৭২	২০
গুজরাট	১৫৫৪৬	১৪৪৯৮	৭৯১৩৮	১০৯১৮২	১৯৪৭	২
কর্ণাটক	১৫৬৬২	১৫২৩৯	৫৪৩৩৭	৮৫২৩৭	১০৪০১	১২
কেরালা	৩১৬৭	৬১০৮	২৬০৪৭	৩৫৩২১	৭৬১৭	২২
মহারাষ্ট্র	২৩১২৯	২৬৪৯৭	১০৫২৬০	১৫৪৮৮৬	১১০২০	৭
তামিলনাড়ু	১৫৭৬১	১৯১৯০	৭১১০৭	১০৬০৫৮	৫৩৭৫	৫
দাদরা এবং নগর হাভেলি	৪৬	৬৩	১৪৫৮	১৫৬৭	৬০১	৩৮
মোট নিঃসরণ (গিগা গ্রাম)				**৪৯৬৭০৩**	**৩৭৮৩৩**	**৮**

সুস্থায়ী ও স্বাস্থ্যকর জীবিকার লক্ষ্যে জল এবং খাদ্য নিরাপত্তা

পরিবেশের দিক থেকে পলকা পশ্চিমঘাট তার বছরভর নাব্য নদীনালার মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যে জল এবং খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে আসছে। অববাহিকা এলাকায় ল্যান্ডস্কেপের কাঠামো বদলে গেলে তার প্রভাব পড়ে জলসম্পদ ব্যবস্থার উপরে। পশ্চিমঘাটে ক্ষয়প্রাপ্ত বা একটু-আধটু টিঁকে থাকা বনজঙ্গল এলাকায় সারা বছর জল না থাকা নদীনালা তার জলজ্যান্ত নজির। তুলনায় ঘন বনে ঢাকা অববাহিকায় সারা বছর বয়ে চলা নদনদীর সংখ্যা ঢের ঢের বেশি। দেশি প্রজাতির গাছপালা ৬০ শতাংশের বেশি এমন অববাহিকায় নদীতে জল থাকে বারো মাসই। দেশি প্রজাতির গাছ থাকার দরুন মাটি ছিদ্রবহুল হওয়ায় অববাহিকার জল চুঁইয়ে যাওয়াই এর মূল কারণ। নানা ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণী ও গাছের শিকড় পরস্পরের উপর কাজ করে এবং মাটি তার পুষ্টিকর খাবার গাছপালায় চালান দেয় ও মাটি হয় ছিদ্রভরা। বছরভর নাব্য এবং মরশুমি নদীনালার অববাহিকা অঞ্চলের মাটির নমুনা পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে সারা বছর নাব্য নদীর অববাহিকার মাটিতে আর্দ্রতার হার সবচেয়ে বেশি (৬১.৪৭ থেকে ৬১.৫৭ শতাংশ), বেশি পুষ্টি (নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ফসফেট সমৃদ্ধ)। সে তুলনায় মরসুমি নদীনালার অববাহিকায় মাটির পুষ্টি কম। জল ব্যবস্থা বজায় রাখতে, দেশি গাছের বনাঞ্চলের বিশদ ভূমিকা এই বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি তা সংশ্লিষ্ট সরকারি এজেন্সির জলবিভাজিকা (অববাহিকা/উপত্যকা) ব্যবস্থাপনার পক্ষেও বেশ কাজের। আধাখ্যাঁচড়া প্রশাসন এবং নীতি প্রণেতাদের

মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক রীতিনীতি নিয়ে দূরদর্শিতার অভাব বনোচ্ছেদ ও জমির মান নেমে যাওয়ার বড়ো কারণ।

মাটিতে আর্দ্রতা এবং জল পাওয়ার সঙ্গে মানুষের রুজিরুটির এক তুলনামূলক মূল্যায়ন থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে দেশি প্রজাতির গাছগাছড়ায় ভরা (৬০ শতাংশের বেশি) অববাহিকায় মটির আর্দ্রতা এবং মটির নিচে জল শুখার সময় মরসুমি নদীর অববাহিকার থেকে বেশি। বছরভর জল থাকার দরুন মাটি বেশি আর্দ্র হওয়ায় বাণিজ্যিক শস্য চাষে সুবিধে হয়। চাষির উপার্জন বাড়ে। শুখা ঋতুতে জলের আকালে মরসুমি নদীর অববাহিকা অঞ্চলের চাষিরা কিন্তু মার খায়। স্থানীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে জল বাঁচানোর সঙ্গে মানুষের জীবিকায় সহায়তার দিকটি তুলে ধরে, অববাহিকায় দেশি প্রজাতির গাছ টিঁকিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বাগিচা ফসল (সুপুরি, নারকেল, কলা, পান, মরিচ ইত্যাদি) বছরভর জল থাকা নদীনালার দেশে বড়ো রোজগেরে পণ্য। বাগিচা ফসল বেচে হেক্টরপিছু বার্ষিক (২০০৯-'১০ সাল) গড় আয় হয়েছিল ৩,১১,৭০১ টাকা। আর প্রতি হেক্টর গড় খরচ ছিল বছরে ৩৭,০৪৩ টাকা (মূলত বাগান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য)। বছরে হেক্টরপিছু নিট আয়ের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ২,৭৪,৬৫৮ টাকা। পক্ষান্তরে, মরশুমি নদীর অববাহিকা অঞ্চলে (আয় কষার জন্য ধান এবং বাগিচা ফসল দুটোই হিসেবের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল) গড় মোট আয় ছিল প্রতি হেক্টরে বার্ষিক ১,৫০,৬৭৯ টাকা। রক্ষণাবেক্ষণ এবং জমি তৈরি বাবদ হেক্টরপিছু বছরে খরচ হয়েছিল ৬,৪৭৪.১০ টাকা। এথেকে বোঝা যায়, নদীতে সারা বছর জল বইলে সে এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকে। সামাজিক এবং বাস্তুসংস্থানের চাহিদা মেটাতে সবসময় জলের জোগান অব্যাহত রাখার জন্য তাই অববাহিকা অঞ্চলের ভূমিকা অপরিহার্য। দেশি প্রজাতির গাছপালা বেশি এমন অববাহিকায় নদীতে সব মরশুমে জল বওয়ার ঘটনা থেকে তা দিব্যি মালুম করা যায়।[৩-৪] আজকের যুগে নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অব্যবস্থাপনা বড়ো বেশি প্রকট। তার সঙ্গে যুগলবন্দিতে আছে বন হাসিলের বাড়াবাড়ি, বেমানান শস্য চাষ এবং জল ব্যবহারে দক্ষতার খামতি। হতাবশিষ্ট দেশি গাছের বনের বেঁচেবর্তে থাকার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জল নিরাপত্তা (বছরভর নাব্য নদীনালা) এবং খাদ্য নিরাপত্তার (জীববৈচিত্র্যের সুস্থায়িত্ব) জন্য তা একান্তই আবশ্যক। সব শেষ হয়ে যায়নি, খোয়া যাওয়া প্রাকৃতিক বনজঙ্গল আদি অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ এখনও আছে. তবে এজন্য চাই যথোপযুক্ত সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা। বিশ শতকে নীতি প্রণেতাদের নেওয়া সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার রীতপ্রকরণ আজও বহাল। এই চল বা রেওয়াজের দরুন অববাহিকা এলাকায় জল ধরে রাখার ক্ষমতায় ধস নামছে। মাথাচাড়া দিচ্ছে জলের তীব্র সংকট। গত টানা তিন বছর, ২৭৯-এর মধ্যে ১৮০-টি জেলা খরায় কাহিল। পশ্চিমঘাটে গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাতের দিন কমেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের দরুন আশু জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বনজঙ্গল সাবাড় বা কার্বন নিঃসরণ কমানোর ব্যবস্থাদি সংকোচন; এর সঙ্গে কার্বন ছড়ানো বৃদ্ধি পাওয়াতেই বিশ্ব উষ্ণায়নের এই দাপট।

এক লক্ষ ষাট হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত পশ্চিমঘাট ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তনের (৩২,৮৭,২৬৩ বর্গকিলোমিটার) মাত্র ৪.৮৬ শতাংশ। এই পশ্চিমঘাটের প্রায় ১.৯৪ শতাংশ এলাকা (৬৪,০০০ বর্গকিলোমিটার) বাস্তুসংস্থানের দিক থেকে সংবেদনশীল। দাক্ষিণাত্যে ১০ কোটি হেক্টর জমিতে চাষের জন্য জলের জোগান বজায় রাখতে এই সংবেদনশীল এলাকার দাক্ষিণ্য আবশ্যক। সম্প্রতি কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং কেরালায় বন্যা ও তারপর খরার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা পশ্চিমঘাটে বন ব্যবস্থাপনায় গলতির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায়। অল্প সময়ে জোর বৃষ্টি হলেও, অববাহিকা এলাকায় চুঁইয়ে পড়ার মাধ্যমে জল ধরে রাখার ক্ষমতা কমার দরুন বেশিরভাগ বৃষ্টির জল জলে গেছে। সেই জল বয়ে গেছে সমুদ্রের পানে। বৃষ্টি পড়ার দিন কয়েক পরেই তাই দেখা গেছে জলের অনটন এবং কাদামাটি ইত্যাদির ধস নেমে প্রাণ ও সম্পত্তিরও হানি হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হয়ে উঠতে এবং সুস্থসবল নাগরিকদের এক উন্নয়নশীল দেশের তকমা অর্জনে অর্থনীতিকে এলেমদার করে তোলার জন্য সাহায্য করতে দাক্ষিণাত্যে কৃষি ও ফুলফলের চাষ টিঁকিয়ে রাখতে পশ্চিমঘাটের মতো বাস্তুসংস্থানের দিক থেকে ঠুনকো আঞ্চলকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা জরুরি।

জমি, কাঠ এবং জল মাফিয়ার মর্জিমাফিক একপেশে বা ভারসাম্যহীন উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দেশের অর্থনীতিকে ডুবিয়ে ছাড়বে, বন্যা ও খরার কোপ আছড়ে পড়বে ঘুরেফিরে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Ramachandra, T.V. & Bharath, S. (2019a) Carbon sequestration potential of the forest ecosystems in the Western Ghats, a global biodiversity hotspot, *Nat Resour Res* (2019) : pp.1-19. https://doi.org/10.1007/s11053-019-09588-0

(২) Ramachandra T. V. & Bharath S, (2019b) Global Warming Mitigation through Carbon Sequestrations in the Central Western Ghats. *Remote Sensing in Earth Systems Sciences*, https://doi.org/10.1007/s41976-019-0010-z

(৩) Ramachandra T.V, Vinay S, Bharath S, Shashishankar A, (2018a). Eco- Hydrological Footprint of a River Basin in Western Ghats, YJBM : *Yale Journal of Biology and Medicine* [Issue Focus : Ecology and Evolution] 91 (2018), pp. 431-444

(৪) Ramachandra, T.V., Bharath, S., & Gupta, N., (2018b). Modelling landscape dynamics with LST in protected areas of Western Ghats, Karnataka. *Journal of Environmental Management*, 206, 1253-1262. https://doi.org/10.1016/j. jenvman.2017.08.001

(৫) Ramachandra, T.V., Bharath, H.A., & Sreejith, K., (2015). GHG footprint of major cities in India. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 44, 473-495. https://doi.org/10.1016/j. rser.2014.12.036

(৬) Ramachandra, T.V., Hegde, G., Setturu, B., & Krishnadas, G., (2014). Bioenergy: A sustainable energy option for rural India. *Advances in Forestry Letters (AFL)*, 3(1), 1-15.

কৃষিক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের উদ্যোগ

চন্দ্রশেখর রাও নুথালাপাতি

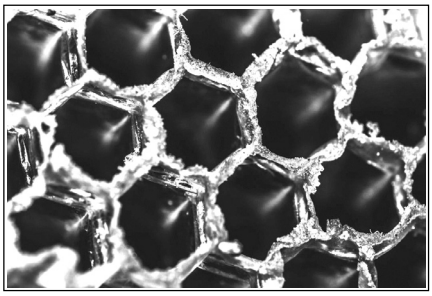

নিত্যনতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সেসম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে তোলায় বেসরকারি উদ্যোগের কথা এতদিন তেমনভাবে শোনা যায়নি বা তাত্ত্বিক আলোচনায় স্থানও পায়নি। কৃষির বিকাশে এইসব নয়া উদ্যোগের বিষয়টি সম্পর্কে সরকারি মহল অবশ্যই সচেতন। ২০১৯-এ ১২ জন কৃষিজীবীকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান সরকারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক বলা যেতে পারে। এই ১২ জনই নিজেদের নতুন কর্মপ্রণালী সম্পর্কে অন্য কৃষকদের সচেতন ও অবহিত করে, প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষির সার্বিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

উপার্জন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার দিশায় পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত কৃষক ও কৃষিবিদদের নানান উদ্যোগ এই নিবন্ধের বিষয়।

কৃষিক্ষেত্রের নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশের লক্ষ্যে কর্ষণ-প্রণালীর উন্নয়ন এবং কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধির নানান উদ্যোগ চোখে পড়ছে এখন। এই প্রবণতা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের দায়ভার সরকারের, এই ছিল প্রচলিত ধারণা। নিত্যনতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সেসম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে তোলায় বেসরকারি উদ্যোগের কথা এতদিন তেমনভাবে শোনা যায়নি বা তাত্ত্বিক আলোচনায় স্থানও পায়নি। কৃষির বিকাশে এইসব নয়া উদ্যোগের বিষয়টি সম্পর্কে সরকারি মহল অবশ্যই সচেতন। ২০১৯-এ ১২ জন কৃষিজীবীকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান সরকারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক বলা যেতে পারে। এই ১২ জনই নিজেদের নতুন কর্মপ্রণালী সম্পর্কে অন্য কৃষকদের সচেতন ও অবহিত করে, প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষির সার্বিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবন

উৎপাদন ক্ষেত্রে সরাসরি কাজের দায়িত্বে থাকা কারখানার শ্রমিক ও কর্মীদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা সার্বিকভাবে প্রযুক্তি উন্নয়নে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, একথা বলে ইতিহাস। উন্নত এবং উন্নয়নশীল, দুই বর্গের দেশের ক্ষেত্রেই তা দেখা গেছে।[১] ঠিক একইভাবে, কৃষিক্ষেত্রে কৃষকরাও প্রযুক্তির সামগ্রিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেন। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত কৃষকদের কর্মকাণ্ডেই তার প্রমাণ মেলে। পদ্মশ্রী বল্লভভাই ভাসরামভাই মারভানিয়ার কথাই ধরা যাক। গুজরাতের জুনাগড়ে গত শতকের চল্লিশের দশকের শেষের দিক থেকে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন গাজর চাষের নিত্যনতুন প্রণালীর উদ্ভাবনে। তৈরি হয়েছে ‘মধুবন গাজর’, যা আকৃতি এবং গুণগত বিচারে এগিয়ে। উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। এই ধরনের গাজরের প্রক্রিয়াকরণও সুবিধাজনক। রাজস্থানের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই প্রজাতির গাজর চাষে

[লেখক নতুন দিল্লির Institute of Economic Growth-এর অধ্যাপক। ই-মেল : chandra@iegindia.org]

উৎসাহিত করেছে কৃষকদের। তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রেও।

ফুলকপি চাষ নিয়ে রাজস্থানের জগদীশ প্রসাদ পারিখ পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে ১৯৭০ সাল থেকে। তার 'অজিতা নগর প্রজাতির' ফুলকপি কলেবরে বড়ো, গুণগত প্রশ্নে শ্রেয়। রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছাড়াই তা ফলানো সম্ভব। তাপপ্রবাহেও নষ্ট হয় না এই ফসল।

'উদ্ভাবন'-এর অর্থ হল এমন কিছু, যা আগে কখনও হয়নি এবং যার ফলে নতুন পণ্য ও পরিষেবা পেতে পারেন মানুষ।[২] অন্য পদ্মশ্রী প্রাপকরাও নিজের নিজের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের স্বাক্ষর রেখেছেন। উত্তরপ্রদেশের বড়াবাঙ্কির রামশরণ ভার্মা-র ক্ষেত্রে কলাচাষ। তিনি উৎকৃষ্ট প্রজাতির গাছের অংশবিশেষ নিয়ে কৃত্রিম মাধ্যম ও প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের (Tissue Culture) সাহায্যে কলার উৎপাদনে নজির সৃষ্টি করেছেন। হরিয়ানার কার্নালে সুলতান সিং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী চাষের ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহার (re-circulating)-এর যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন তাতে জলের ব্যবহারও প্রয়োজনে কমে যায় অনেকখানি। হরিয়ানার পানিপথের নরেন্দ্র সিং দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে নজর কেড়েছেন।

রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো

পুরস্কারপ্রাপ্তদের অনেকেই রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব চাষে সাফল্যের পথ দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হায়দরাবাদের ইয়াদলাপাল্লি ভেঙ্কটেশ্বর রাও, উত্তরপ্রদেশের বুলন্দ শহরের ভারতভূষণ ত্যাগী, রাজস্থানের ঝালওয়ারের হুকুমচাঁদ পাতিদার, ওড়িশার কোরাপুটের কমলা পূজারী, বিহারের মুজফ্‌ফরপুরের রাজকুমারী দেবী (কিষাণ চাচি)-র নাম উঠে আসে। উন্নত কৃষিপ্রণালী এবং শস্য সংরক্ষণে তারা নিজের নিজের এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন।

মধ্যপ্রদেশের দাহিয়ায় ধান চাষিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন বাবুলাল দাহিয়া। ওড়িশার কমলা পূজারী ধান, হলুদ এবং তিল চাষিদের নিয়ে কাজ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের ভারতভূষণ এবং গুজরাটের ভি. ভি. মারভানিয়া, একই জমিতে একই সঙ্গে একাধিক ফসলের উৎপাদন (intercropping)-এর সুফল বুঝিয়েছেন এলাকার কৃষকদের। পর্যায়ক্রমে আলাদা আলাদা শস্যের চাষের (crop rotation)-এর কার্যকারিতা বুঝিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের আর. এস. ভার্মা। হরিয়ানায় ছোটো ভুট্টা (babycorn) চাষিদের সংগঠন তৈরি করেছেন কানওয়াল সিং। উন্নত কৃষিপ্রণালীর বিষয়ে সচেতনতার প্রসারের লক্ষ্যে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন রাজকুমারী। উত্তরপ্রদেশের আর. এস. ভার্মা সমবায় ভিত্তিক চাষের কার্যকারিতা বুঝিয়েছেন এলাকার কৃষকদের।

কৃষিকাজে বৈচিত্র্য

চিরাচরিত পদ্ধতির পথে না হেঁটে চাষে বৈচিত্র্য এনে গ্রামের যুবকদের উপার্জনের রাস্তা খুলে দিয়েছেন পুরস্কারপ্রাপকের অনেকেই। যে জমিতে শুধুমাত্র তামাকের চাষ হ'ত, সেখানে খাদ্যশস্য তৈরি নিয়ে

পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন রাজকুমারী। এজন্য এলাকাটির মাটির গুণগত বৈশিষ্ট্য, বিপণন, সব দিকগুলিই খতিয়ে দেখতে হয়েছে তাকে। কেবলমাত্র ধান ও গম চাষের পথ ছেড়ে ১৯৯৭ সালে ছোটো ভুট্টা (babycorn) ফলানোয় হাত লাগান। হরিয়ানার সোনপতের কানওয়াল সিং। অনেক বেশি লাভের মুখ দেখেছেন তিনি। তাকে দেখে এলাকার প্রায় ৫ হাজার কৃষক ছোটো ভুট্টা এবং পর্যায়ক্রমে ছত্রাক (mushroom)-এর চাষ শুরু করেন। একটি সংগঠন তৈরি করে ছোটো ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থাও করেছেন তারা। এজন্য বিনিয়োগ করেছেন দেড় কোটি টাকা। এলাকায় এর ফলে প্রচুর মানুষ কাজ পেয়েছেন। হরিয়ানার পানিপথের নরেন্দ্র সিং গবাদি পশুপালন এবং দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নততর পন্থার সন্ধান দিয়েছেন। রামনগরের হুলিকুল গ্রামে মরুভূমির মতো এলাকাকে সবুজ আস্তরণে ঢেকে দিয়েছেন সালুমুরাদা থিমাক্কা। বালতি বা পাত্রে করে বয়ে এনে জল দিয়েছেন গাছের গোড়ায়। সেখানে আট হাজারের বেশি গাছ রয়েছে এখন।

চাহিদার (Consumption Pattern) পরিবর্তন

জোয়ার বা ছোটো ভুট্টার পুষ্টিগুণ সম্পর্কে ইয়াদলাপাল্লি ভেঙ্কটেশ্বর রাও-এর নিরলস প্রয়াস তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে শস্যের চাহিদার ধরনটাই অনেকটা পালটে দিয়েছে। বস্তুত, এইসব ফসলের আগে তেমন 'কৌলিন্য' ছিল না। এদের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে প্রচারের ফলে এখন পরিস্থিতি আলাদা। ২০১৮ সালটিকে ভারত সরকার ঘোষণা করে জাতীয় জোয়ার বর্ষ (National Year of Millets) হিসেবে। ওই বছর এধরনের ফসলগুলিকে 'পুষ্টিগুণসমন্বিত শস্য' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৩] এইসব উদ্যোগ রাষ্ট্রসংঘের ধারাবাহিক উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহের আওতায় ঘোষিত পুষ্টি দশক (২০১৬-'২৫) কর্মসূচিরই অঙ্গ।

এক্ষেত্রে, চাহিদার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। রাও এবং তার সহযোগী খাদার ভালি অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা অঞ্চলের পরিচিত নাম। এখন অনেক সময়েই জোয়ার বা ছোটা ভুট্টার চাহিদা সরবরাহের তুলনায় বেশি হয়ে যাচ্ছে। দামও বাড়ছে এইসব ফসলের। কর্ণাটকেও জোয়ার বা ভুট্টার চাহিদা বাড়ছে ক্রমশ।[৪] তবে চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সুফল চাষিরা কতটা পাচ্ছেন তা নিয়েও চিন্তাভাবনার দরকার আছে। এইসব ফসল যারা ফলাচ্ছেন সেইসব দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ষাটের দশকের পর থেকে জোয়ার বা ভুট্টা চাষে উৎপাদনশীলতা থমকে রয়েছে। তা বাড়ানোয় চাই গবেষণা। ৫০-এর দশকে ধান এবং গম চাষে উৎপাদনশীলতা ছিল আলোচ্য ফসলগুলির মতোই। পরে ধান ও গমে উৎপাদনশীলতা চারগুণ বেড়ে গেলেও

ভুট্টা বা জোয়ারের ক্ষেত্রে ছবিটা তত আশাপ্রদ নয়।

নগরাঞ্চলে কৃষিকাজ

শহরের মানুষ ক্রমশই স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠছেন। তাদের অনেকেই এখন জৈব চাষের পদ্ধতিতে উৎপন্ন ফসলের খোঁজ করেন। এইসব অঞ্চলে জনসংখ্যাও বাড়ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে স্থানীয় এলাকায় উৎপাদিত ফসলের চাহিদা। বাড়ির ছাদে বাগান তৈরি করছেন অনেকে। সেখানকার শাক-সবজি খাওয়ার কাজেও লাগে, আবার গাছপালা থাকায় বায়ুদূষণও অন্তত কিছুটা হলেও কমে। চিন এবং ইউরোপে, শহরে শাক-সবজি ফলানোর রীতি এখন বেশ প্রচলিত। ভারতেও এক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভিত্তিতে কাজ শুরু করেছে কয়েকটি আনকোরা নতুন (Start Up) সংস্থা।

পরিশেষে একথা বলাই যায়, যে পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত কৃষিজীবীদের প্রসঙ্গটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেসরকারি উদ্যোগে কৃষির উন্নয়নের নতুন প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, চাহিদার পুনর্বিন্যাস এবং হালফিলের শহুরে চাষবাস, খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি কৃষিজীবীদের উপার্জন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। সরকার এবং আধা-সরকারি সংস্থাগুলি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে লক্ষ্যপূরণে আরও দ্রুততার সঙ্গে এগনো সম্ভব। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এই দিকটি মাথায় রাখা জরুরি।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Freeman, Chris. (1994). Critical Survey : The economics of technical change, *Cambridge Journal of Economics,* 18 : 463-514.

(২) Rao, N. Chandra Sekhara, Sutradhar, Rajib and Reardon, Thomas. (2017). Disruptive Innovations in Food Value Chains and Small Farmers in India, *Indian Journal of Agricultural Economics,* 72(1) : 24-48. Keynote Address delivered at the 76th Annual Conference of the Indian Society of Agricultural Economics organised in Assam Agricultural University, Jorhat during November 21-23, 2016.

(৩) Kulkarni, Vishwanath. (2018). From Green Revolution to Millet Revolution, *The Hindu Business Line,* March 26. With inputs from K.V. Kurmanath and Shobha Roy. https://www.thehindubusinessline. com/specials/india-file/from-green-revolution-to-millet-revolution/article23356997.ece. Accessed on 15.5.2019

(৪) Dey, Sohini. (2018). The Millet rises, *Live Mint,* October 13, 2018. https://www.livemint.com/Leisure/ cvazXsjdfTHbxXaK0yVQFJ/The-millet-rises.html.

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

মঞ্জুলা ওয়াধাওয়া

ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত মানের উচ্চ প্রযুক্তির সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার তৈরির কিছু সুযোগসুবিধে থাকলেও, এখানে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ক্ষেত্র (Recycling Sector) এখনও তেমন জুতসই নয়। কম্পিউটার, মনিটর এবং টেলিভিশন ব্যবহার লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলার বিপদের ব্যাপার এখনও বহু মানুষের অজানা। এসব জিনিস মাটিতে পুঁতে ফেললে এবং নাবাল জমি ভরাট করার কাজে লাগালে বা পুড়িয়ে দিলে স্বাস্থ্যের বিপদ বাড়ে; কেননা এসবে থাকে বিপজ্জনক উপাদান। বৈদ্যুতিন জঞ্জাল ঠিকমত দূর না করলে ক্ষতি হয় পরিবেশেরও।

বিশ্বের অন্যতম বড়ো এবং দ্রুত বিকাশকারী বৈদ্যুতিন শিল্প ভারতের উন্নয়নশীল সমাজের আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধে করে দিয়েছে। অবশ্য, এই শিল্পের গ্রাহক-অভিমুখী বিকাশ এবং তার সঙ্গে যুক্ত দ্রুত বাতিলের পর্যায়ে পড়া জিনিসপত্র ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি পরিবেশের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ খাড়া করেছে, সেকেলে বৈদ্যুতিন সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতির বর্জ্যের বিপদ বাড়ছে। বৈদ্যুতিন, বিশেষত কম্পিউটার বর্জ্যের বিপুল পরিমাণ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজটিকে ক্রমশ আরও জটিল করে তুলছে। ভারতে ইতোমধ্যেই এই কঠিন বর্জ্য সামাল দেওয়াটা এক দারুণ ঝক্কির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত শতকে তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি ভারতীয়, বিশেষ করে শহুরে মানুষের জীবনশৈলীতে এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কিন্তু এর অব্যবস্থাপনার দরুন গজিয়ে উঠেছে দূষণের নতুন নতুন সমস্যা। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পার্সোনাল কম্পিউটারের কথা তুলে ধরা যায়। এই কম্পিউটারে থাকে কিছু মারাত্মক বিষাক্ত যন্ত্রাংশ। যেমন, ক্লোরিনায়িত (Chlorinated) এবং ব্রোমিনায়িত (Brominated) পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস, বিষাক্ত ধাতু, অ্যাসিড, প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক অ্যাডিটিভ যা কিনা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। বিশ্বে পার্সোনাল কম্পিউটারের বাজার আদৌ চরমসীমায় পৌঁছে না যাওয়ায়, অর্থাৎ সোজা কথায় বিক্রি বেড়ে চলায় এবং এই কম্পিউটারের গড় আয়ু দ্রুত কমতে থাকায়, বৈদ্যুতিন বর্জ্যের ডাঁই বেড়ে চলেছে। ১৯৯৭ সালে কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) কাজ চালাতো ৪-৬ বছর। ২০০৫-এ তার আয়ু কমে দাঁড়ায় ২ বছর মাত্র।

অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ এবং তার দোসর নগরায়ণ এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সাজসরঞ্জামের ব্যবহার আর উৎপাদন দুইই বেড়েছে।

ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত মানের উচ্চ প্রযুক্তির সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার তৈরির কিছু সুযোগসুবিধে থাকলেও, এখানে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ক্ষেত্র (Recycling Sector) এখনও তেমন জুতসই নয়। কম্পিউটার, মনিটর এবং টেলিভিশন ব্যবহার লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলার বিপদের ব্যাপার এখনও বহু মানুষের অজানা। এসব জিনিস মাটিতে পুঁতে ফেললে এবং নাবাল জমি ভরাট করার কাজে লাগালে বা পুড়িয়ে দিলে স্বাস্থ্যের বিপদ বাড়ে; কেননা এসবে থাকে বিপজ্জনক উপাদান। বৈদ্যুতিন জঞ্জাল ঠিকমত দূর না করলে ক্ষতি হয় পরিবেশেরও।

গত দশক থেকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প হয়ে উঠেছে অর্থনীতির এক বড়ো চালিকাশক্তি। সমাজে আরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং সহজে তথ্য জোগাড় ও আদানপ্রদান ব্যবস্থা করে এই শিল্প আমাদের নিত্যজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিপ্লবে অবদান রেখেছে

[লেখক সহ-জেনারেল ম্যানেজার, নাবার্ড, চণ্ডীগড়। ই-মেল : manjula.jaipur@gmail.com]

যথেষ্ট। ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত দ্য গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট মনিটর, ২০১৭-র হিসেব, ভারতে ফি বছর ২০ লক্ষ টনের মতো বৈদ্যুতিন জঞ্জাল তৈরি হয়। এর প্রায় ৮২ শতাংশ ব্যক্তিগত ব্যবহারের যন্ত্রপাতি। আর এক সমীক্ষা জানিয়েছে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের ৭০ শতাংশের দায়ভাগ কম্পিউটার ও তার সাজসরঞ্জামের। এরপর আছে ফোনের মতো টেলি-যোগাযোগ সরঞ্জাম (১২ শতাংশ), বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (৮ শতাংশ) এবং চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম (৭ শতাংশ)। বাদবাকির জন্য দায়ি হচ্ছে ঘরগেরস্থালির বৈদ্যুতিন জঞ্জাল।

সমস্যার মাত্রা বোঝার পর, আমাদের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যে তার কুপ্রভাব খতিয়ে দেখা যাক। বৈদ্যুতিন জিনিস হচ্ছে বেশ কয়েকশ' অতিক্ষুদ্র উপাদানের এক জটিল মিশ্রণ। এসব অনেক উপাদানে থাকে মারাত্মক রাসায়নিক বস্তু যা কিনা মানুষের শরীরস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক। বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের অধিকাংশ উপাদানে আছে সিসে, ক্যাডমিয়াম, পারা, পলিভাইনিল ক্লোরাইড (PVC), ক্রোমিয়াম, বেরিলিয়াম ইত্যাদি। টিভি, ভিডিও এবং কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় ক্যাথোড রে টিউব (CRT)। এই টিউবে প্রচুর সিসে থাকে এবং এর সামনে বহু সময় অরক্ষিত অবস্থায় থাকলে বৃক্ক (Kidney), হাড় ও স্নায়ু ব্যবস্থা তো বটেই, এমনকি প্রজনন এবং থাইরয়েড ও অ্যাড্রেনাল-এর মতো এনডোক্রাইম ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব উপাদানের কিছু কিছু চড়া মাত্রায় ক্যান্সারজনক। ঘরগেরস্থালির আবর্জনার সঙ্গে এই বৈদ্যুতিন বর্জ্য কোনও বাছবিচার ছাড়াই (পুনর্ব্যবহারযোগ্য না করে পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে দেওয়া) অপসারণ করলে জল, মাটি ও বাতাস দূষিত হতে পারে।

বৈদ্যুতিন সামগ্রী/যন্ত্রপাতিকে মোটামুটি তিনটি বড়ো অংশে ভাগ করা যায় :

● ভারী সামগ্রী (white goods) : ঘরগেরস্থালির সাজসরঞ্জাম।

সারণি-১

উপাদান বা সামগ্রী	ওজন (%)	ফের ব্যবহারযোগ্য	কিসে থাকে	কুফল
সিসে	৬.২৯৮৮	৫	অ্যাসিড ব্যাটারি, ক্যাথোড রে টিউব (CRT)	বৃক্ক বিকল, প্রজনন এবং স্নায়ু তন্ত্রের ক্ষতি
ক্যাডমিয়াম	০.০০৯৪	০	ব্যাটারি, ক্যাথোড রে টিউব, ঘরবাড়ি	লম্বা মেয়াদে বিষ জমা, হাড়ের রোগ
পারা	০.০০২২	০	ব্যাটারি, সুইচ, বাড়িঘর	মস্তিষ্কের দুরারোগ্য ক্ষতি, যকৃৎ-এর ক্ষতি, ভ্রূণ এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি
ক্রোমিয়াম-৬	০.০০৬৩	০	শক্তপোক্ত করার অলংকরণ (Decorative hardener), ক্ষয়রোধকারী পদার্থ	ডিএনএ-র ক্ষয়ক্ষতি, ফুটফুসে কর্কটরোগ
প্লাস্টিক	২২.৯৯ (২২.৭৭)	২০	কম্পিউটার ছাঁচ (Computer modulings) তার (Cablings)	ডাইটক্সিন (Dioxins) ফিউরান (Furan)

● হালকা সামগ্রী (brown goods) : টিভি, ক্যামকভার, ক্যামেরা।

● কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স মেশিন, স্ক্যানার ইত্যাদি সামগ্রী (grey goods)।

তৃতীয়টির তুলনায় প্রথম দু'টি ভাগের বর্জ্য সামগ্রী কম বিষাক্ত। সারণি-১-এ স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণির সামগ্রীর কুফল দেখানো হয়েছে।

বাতাস, জল এবং মাটির উপরে প্রভাব

বাতাসে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের দরুন দূষণ ঘটে। জঞ্জাল কুড়ুনেরা ফেলে দেওয়া বৈদ্যুতিক জিনিস খুঁজে বেড়ায় বিভিন্ন ভাগাড়ে। এসব জিনিস থেকে তৈরি হয় ফের ব্যবহারের সামগ্রী। বৈদ্যুতিন বর্জ্য বিক্রি করে তারা একটু-আধটু রোজগার করে থাকে বটে, কিন্তু এসব জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করার ঝুঁকিও অনেক। বৈদ্যুতিন জিনিসের সিসে, বেরিয়াম, পারা, লিথিয়াম (মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটারের ব্যাটারিতে থাকা)-এর মতো ভারী ধাতু ঠিকমতো অপসরণ না করলে এসব ভারী ধাতু মাটির ছিদ্র দিয়ে ভূগর্ভস্থ জলে মিশে যায়। সেই জল নদীনালা বা পুকুর মারফত মাটির উপর উঠে আসে। ভূগর্ভস্থ জল বা নদীনালা ও পুকুরের উপরে অনেক সময় মানুষকে নির্ভর করতে হয় বলে তারা ভোগে নানা রোগবালাইয়ে। আর রাসায়নিকের দরুন জলজ গাছাপালা এবং প্রাণীর মৃত্যু ছাড়াও, মানুষ ও অন্যান্য জীবের দেহে এই দূষিত জল থেকে ঢোকে বিষাক্ত সিসে।

সোনা ও অন্যান্য দামি ধাতু পাওয়ার জন্য, খোলা জঞ্জালখানায় বৈদ্যুতিন বর্জ্য পোড়ালে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার উৎপত্তি ঘটে এবং এই ভাসমান কণা হৃদরোগ ও শিশুদের ফুসফুস এবং শ্বাসরোগের কারণ। বাতাসে ভেসে বেড়ানো বিষাক্ত অণু মাটি-ফসল-খাদ্যে ঢুকে মানুষ এবং অন্যান্য জীবের শরীরস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে থাকে চড়া মাত্রায় পারা এবং তা ঠিকমতো দূর না করলে চামড়া ও শ্বাস রোগ ছড়াতে পারে। সিসে-দূষিত জল খেলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মগজের যথাযথ বিকাশ

বৈদ্যুতিন বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা) সংশোধন বিধি, ২০১৮-র প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

১। বৈদ্যুতিন বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা হয়েছে এবং তা পয়লা অক্টোবর, ২০১৭ থেকে কার্যকর। পর্যায়ক্রমে এই বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-'১৮ সালে ওজনের নিরিখে মোট বর্জ্যের ১০ শাতংশ। ২০২৩ সাল অবধি ফি বছর সংগ্রহের পরিমাণ ১০ শতাংশ বাড়বে। ২০২৩-এর পর থেকে মোট বর্জ্যের ৭০ শতাংশ সংগ্রহ করার লক্ষ্য ধার্য হয়েছে।

২। নতুন উৎপাদকদের জন্য বৈদ্যুতিন বর্জ্য সংগ্রহের পৃথক লক্ষ্যমাত্রার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসব উৎপাদক বিক্রিবাটার কাজ চালাচ্ছে যে ক'বছর তা তাদের উৎপাদিত পণ্যের গড় মেয়াদের চেয়ে কম। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের জারি করা নীতিনির্দেশিকা মাসিক উৎপাদিত পণ্যের এই গড় আয়ু ঠিক করা হবে।

৩। বিধান অনুযায়ী কাজকর্ম চালাতে রেজিস্ট্রির জন্য কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে আবেদন করতে হবে।

৪। বিপজ্জনক পদার্থ হ্রাসের সংস্থান এর আওতায় বিপজ্জনক পদার্থ কমানোর নমুনা এবং পরীক্ষার জন্য ব্যয় সরকার বহন করবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে তার খরচ উৎপাদক দেবে।

বৈদুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০১৬ সংশোধিত হয়েছে ২০১৮ সালের ২২ মার্চের বিজ্ঞপ্তি মারফত।

উৎস : *প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো*

হয় না। শ্রবণ ক্ষমতা কমে, দেহের স্বাভাবিক বাড় ব্যাহত হয়, অর্থাৎ বেঁটে হওয়ার সম্ভাবনা এবং রক্তের কোষ গঠন ও তার কাজকর্ম প্রভাবিত হয়। স্বাভাবিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়ায়, এসব রাসায়নিক বহুকাল যাবৎ পরিবেশে টিঁকে থাকে। বিপজ্জনক এসব রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি যায় বেড়ে।

মুশকিল আসান

বৈদ্যুতিন বর্জ্য সঠিক অপসারণের পথ হল এর উৎপত্তি একেবারে কমিয়ে ফেলা। বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ডিজাইনাররা অবশ্যই পুনর্ব্যবহার, মেরামতি এবং/বা উন্নতি করার গুণ বা ক্ষমতা (upgradability) মারফত সেই পণ্যের আয়ু বাড়ানো নিশ্চিত করবেন। কম বিষাক্ত ধাতু বা রাসায়নিক, সহজে পুনরুদ্ধারযোগ্য এবং ফের ব্যবহারযোগ্য উপাদান ব্যবহারে জোর দেওয়া উচিত। এসব উপাদান খুলে নিয়ে আবার বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরির কাজে লাগানো যায়। বৈদ্যুতিন বর্জ্য কমানোর আর এক উপায় হচ্ছে উপাদান ফের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। ধাতু, প্লাস্টিক, কাঁচ এবং অন্যান্য উপকরণের পুনরুদ্ধার বৈদ্যুতিন বর্জ্যের মাত্রা কমাবে। এসব উপায় কাজে লাগালে শক্তি বা জ্বালানি বাঁচবে এবং পরিবেশ বিষাক্ত সামগ্রীর কবলমুক্ত হবে। বৈদ্যুতিন বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর-সহ উৎপাদন এবং ব্যবসা থেকে তা চূড়ান্তভাবে দূর করা সংক্রান্ত যাবতীয় ইস্যু মেটানোর দিকে নীতিপ্রণেতাদের নজরে দেওয়া চাই। বৈদ্যুতিন বর্জ্য আমদানি এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত স্পষ্ট নিয়ামক ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং পরিবেশের পক্ষে শুধু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত দুনিয়া থেকে বৈদ্যুতিন বর্জ্য আমাদের দেশে ঢালাও বন্ধ করতে প্রচলিত আইনি কাঠামোর ফাঁকফোকর বোজানো চাই।

পণ্য উৎপাদকদের অবশ্যই তাদের জিনিসের জন্য আর্থিক এবং আইনগতভাবে দায়ি করতে হবে। একাদশ আন্তর্জাতিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আস্তাকুঁড় আলোচনা চক্র ও নিষিদ্ধ বস্তুর আরও উন্নত ব্যবস্থা এবং পরিবেশের ডিজাইন নিয়ন্ত্রণকারী বিধিনিয়ম বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকর করা দরকার। পণ্যের আয়ু ফুরনোর পর, বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের বিক্রেতাকে তা ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পুরনো বৈদ্যুতিন সামগ্রী সাবধানে খুলে ফেলে তার বিভিন্ন অংশ ফের কাজে লাগানোর বন্দোবস্ত করা দরকার। এজন্য কারখানায় হয় পৃথক রিসাইক্লিং ইউনিট বা কমন ফেসিলিটি থাকা চাই। রিসাইক্লিং ইউনিটে সরাসরি নিয়ে আসার জন্য সঠিক জায়গা থেকে বৈদ্যুতিন বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আর্থিক সম্ভবপরতা ও বাস্তব দিক মাথায় রেখে প্রতিটি বৈদুতিন সরঞ্জাম নির্মাতাকে বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করা দরকার। সংগ্রহ কেন্দ্রগুলি পরিবেশের পক্ষে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নীতিনির্দেশিকা মেনে চলা এবং বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া সংস্থার কাছে বৈদ্যুতিন বর্জ্য পাঠাতে পারে।

গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন বিশ্ব উষ্ণায়ণের এক বড়ো কারণ। এই কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে ফেলা ছাড়াও, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করলে কাঁচামাল থেকে নতুন জিনিস তৈরির দরুন জল এবং বায়ুদূষণও কমে। সংকর পদ্ধতির ক্ষমতা আছে বৈদ্যুতিন বর্জ্য থেকে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য রাসায়নিক এবং জৈব প্রযুক্তি সম্পর্কিত সমস্যা কাটিয়ে ওঠার। এই স্ট্র্যাটেজি আকরিকে থাকা অতি সামান্য পরিমাণ ধাতু উদ্ধারের জন্য ধাতুবিদ্যায় এক নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে দিতে সাহায্য করবে।

বৈদ্যুতিন বর্জ্য অনুমোদিত সংস্থার কাছে পাঠানোর জন্য, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ১২ অক্টোবর, ২০১৮-তে ৭২৬-টি উৎপাদনকারী সংস্থাকে অনুমতি দিয়েছে। এই অনুমতিপত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (পাঁচ বছর) বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্য ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা; সেই লক্ষ্য কতটা পূরণ হল তা খতিয়ে দেখার কোনও স্বাধীন ব্যবস্থা নেই। ফলে কার্যক্ষেত্রে খামতি থেকে যাচ্ছে।

সম্প্রতি নড়েচড়ে বসেছে বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। দেশে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের অভিন্ন তালিকা নিয়ে মন্ত্রক এক নীতিনির্দেশিকা বানিয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুসারে ২০১৭-'১৮

সালে ৬৯,৪১৪ টন বৈদ্যুতিন বর্জ্য সংগ্রহ, ভেঙে ফেলা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। এবছর ১৫ জুলাই বৈদ্যুতিন বর্জ্যজনিত দূষণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে রাজ্যসভায়।

সামনেকার চ্যালেঞ্জ

ভারতে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের মাত্র ১.৫ শতাংশ ফের কাজে লাগানো হয়। বৈদ্যুতিন বর্জ্য এবং তার পুনর্ব্যবহার ও সেইসঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ভূমিকা নিয়ে সচেতনতার অভাব সমস্যায় বাড়তি মাত্রা যোগ করে। বৈদ্যুতিন সামগ্রী ঠিকঠাক খুলে না ফেলার দরুন ফের ব্যবহারযোগ্য অপেক্ষাকৃত কম দামি তামা, টিন, দস্তার মতো ধাতু খোয়াতে হয় এবং এর ফলে মাটিতে দূষণ ছড়ায়। বৈদ্যুতিন বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির গ্রাহক ওয়াকিবহাল নয় সেসব জিনিস বাতিল হওয়ার পরও তা থেকে কিছু পয়সা উশুল করা যায়। ওইসব পণ্যের প্যাকেটে বিক্রিত জিনিস বরবাদ হওয়ার পর বৈদ্যুতিন বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্রের ব্যাপারে সচরাচর কোনও খোঁজখবরের উল্লেখ থাকে না। ক্রেতার দায়িত্বের বিষয়েও সঠিক জানান দেওয়া হয় না।

চাই কারিগরি এবং নীতিস্তরে তৎপরতা, যথাযথ রূপায়ণ, সামর্থ্য গঠন ও মানুষের সচেতনতা বাড়ানো। একমাত্র তারাই পারে চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত এবং পরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বে ভরসাযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড বা মান স্থাপন করতে।❑

উন্নয়ন ও পরিবেশ : ভারসাম্যের লক্ষ্যে

এস. সি. লাহিড়ী

পরিবেশগত ভারসাম্যকে বজায় রেখে উন্নয়নের পথে এগোনোর জন্য চাই সুচিন্তিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ। ভারতের মতো দেশে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র তখনই দু'কূল রক্ষা সম্ভব হবে। নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনালগ্ন থেকেই পরিবেশগত দিকটির জন্য সুরক্ষাকবচ-এর ব্যবস্থা করা উচিত। না হলে পরে পস্তাতে হবে। পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে অবহেলিত রেখে শিল্পায়ন ও উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে উলটো ফল নিয়ে আসতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে মানুষের জীবনযাপন এবং কর্মক্ষমতার ওপরে। শিল্পসংস্থার দূষণ পরিবেশের ব্যাপক হানি ঘটিয়ে চলেছে। কাজেই, শিল্পোন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ভারসাম্যবিধান অত্যন্ত জরুরি। সঠিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের প্রশ্নে পরিবেশ রক্ষা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনাই শেষ কথা নয়। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উদ্যোগও সমান প্রাসঙ্গিক।

উনবিংশ শতকে শিল্প বিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়ে গেছে অনেকগুণ। একেই বলা হচ্ছে 'বৃদ্ধি' বা 'উন্নয়ন'। কিন্তু এই 'বৃদ্ধি' প্রাকৃতিক পরিবেশকে আঘাত হেনেছে দারুণভাবে। ১৯৭২-এ স্টকহোম সম্মেলনে মানুষ ও পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিবেশগত সমস্যাবলীর সমাধানে সমন্বিত বহুমাত্রিক উদ্যোগের কথা উঠে আসে। আসলে, তথাকথিত উন্নয়ন বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে পরিবেশের হানি এড়ানো বেশ একটা জটিল বিষয়। বহু শহরেই দূষণের মাত্রা এখন অত্যন্ত বেশি। পরিবেশ রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে। মানুষের অস্তিত্বের সামনেই উঠবে প্রশ্নচিহ্ন। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলসঙ্কট ক্রমে মাথাচাড়া দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে মানুষের কর্মক্ষমতার ওপর। যা উন্নয়নের মূল্য উদ্দেশ্যকেই আঘাত করে। সেজন্য, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় সারা বিশ্বের উদ্যোগের অন্যতম মূল হোতা হওয়া উচিত ভারতের।[১] কারণ উন্নয়নশীল দেশ ভারত। বিকাশের প্রশ্ন এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে কাজ ও উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া শিল্পায়নের মূল কথা। আবার শিল্পায়নের অনিবার্য অঙ্গ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাখনি, সিমেন্ট ও ইস্পাত কারখানা, পেট্রোল, রাসায়নিক হাওয়ায় ছড়িয়ে দেয় বিষাক্ত গ্যাস। বহুক্ষেত্রেই অপূরণীয় ক্ষতি হয় পরিবেশের।[২]

পরিবেশগত ভারসাম্যকে বজায় রেখে উন্নয়নের পথে এগোনোর জন্য চাই সুচিন্তিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ। ভারতের মতো দেশে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র তখনই দু'কূল রক্ষা সম্ভব হবে। নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনালগ্ন থেকেই পরিবেশগত দিকটির জন্য সুরক্ষাকবচ-এর ব্যবস্থা করা উচিত। না হলে পরে পস্তাতে হবে। পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে অবহেলিত রেখে শিল্পায়ন ও উন্নয়ন দীর্ঘ-মেয়াদে উলটো ফল নিয়ে আসতে পারে। ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও

[লেখক দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ যুক্ত পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে। কৃষি, পশুপালন এবং শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। হরিয়ানা পরিবেশ সংস্থা (Haryana Environment Society)-র মুখ্য কার্যনির্বাহী হিসেবেও দায়িত্বে ছিলেন। ই-মেল : sclahiry@gmail.com]

টাটকা। কিন্তু ওই ধরনের বিপদ মোকাবিলায় এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

রায়পুর দুর্গ, কোরবা-বিলাসপুর, আগ্রা-কানপুর, ভাপি-আঙ্কেলেশ্বর, ধানবাদ-বোকারো, বিশাখাপত্তনম, তারাপুর, লুধিয়ানা, এসব শিল্পায়িত অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ মারাত্মক আকার নিয়েছে। বেশ কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কিংবা ইস্পাত, সিমেন্ট, রাসায়নিক ও পেট্রোলিয়াম কারখানা অত্যাধুনিক জটিল প্রযুক্তি সম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতি বদলায়নি। পরিবেশহানি কমাতে চাই কার্যকর দূষণরোধ ব্যবস্থা। তুল্যমূল্য বিচার করে বিচক্ষণতার সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে শিল্পাঞ্চল।

ভারতে ডিজেল থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের অনুপাত বেশ অনেকটাই। ডিজেল-পোড়া ধোঁয়া পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। উৎপাদনের খরচও অনেক বেশি। এই পথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের থেকে সরে আসতে বাড়ির ছাদে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসিয়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে মূলধন বাবদ সহায়তার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।[৩] নানান ধরনের নীতিসংক্রান্ত সহায়তার কল্যাণে এই পন্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও কম। সরকার গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে দৃঢ়সংকল্প। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় তৎপর থাকতেই হবে এদেশকে।

এদেশে তাপবিদ্যুৎ এবং সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণে ফারাক কমছে। ২০১৮-এ পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩ GW, যা মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ২০ শতাংশের বেশি। ২০১৯-এর ৩১ অক্টোবরের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ৮৩.৪ GW। এর মধ্যে বায়ুবিদ্যুৎ (Wind Energy) ৩৭ GW এবং সৌরবিদ্যুৎ ৩১.৭ GW। পরিবেশ-বান্ধব উৎস থেকে শক্তি উৎপাদন এবং জীবাশ্ম জ্বালানিচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ কমানোয় আরও বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকার। আগামী কয়েক দশকে দেশের শক্তি উৎপাদনে কয়লা এবং অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির বড়ো ভূমিকা থাকবে।

পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির অর্থ হল কাঁচামালের ন্যূনতম ব্যবহার এবং ন্যূনতম বর্জ্য নিষ্কাশন। পরিবেশগত প্রশ্নটি সারা বিশ্বেই শিল্পজগতের ছবিটা বদলে দিচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে 'পরিচ্ছন্ন' প্রযুক্তি। এর ফলে স্থায়ী ও ধারাবাহিক বিকাশের পথ সুগম হবে সন্দেহ নেই।

পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ও নীতির মাধ্যমে একইসঙ্গে একাধিক লক্ষ্যপূরণ হওয়া সম্ভব ও দরকার বলে মনে করে আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা IEA। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছেন যে 'নিরবচ্ছিন্ন স্থানান্তরযোগ্যতা' (Sustainable mobility) বিভিন্ন পরিষেবাকে সুলভ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ভিড় কমাতে পারে এবং বাড়াতে পারে উৎপাদনশীলতা। আবাসন নির্মাণে দক্ষ প্রযুক্তির ব্যবহার লগ্নির পরিমাণ কমানোর পাশাপাশি আবাসিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক। সমন্বিত বিতরণপ্রণালী শক্তির স্থানীয় প্রশ্নে লভ্য উৎসগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের খরচ কমানোয় কার্যকরী। পাশাপাশি এই প্রণালী অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক ও নমনীয়।

২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে ৫ বছরের কর্মপরিকল্পনা NCAP। এর আওতায় কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে বহু স্তরীয় সমন্বয় গড়ে তোলা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan on Climalte Change—NAPCC)-সহ সরকারের অন্য কর্মসূচিগুলিও NCAP-র সঙ্গে সঙ্গেই রূপায়িত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ বিধি বা United Nations Framework Convention on Climate Change—UNFCC-র দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, মানুষের আচরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বিশ্বের আবহমণ্ডলের রূপান্তরকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং গতানুগতিক পরিবর্তনের অতিরিক্ত দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তর ও ব্যাপক বিবর্তনের কথাই বলা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণগুলি হল গড় তাপমান বৃদ্ধি, হিমবাহ-মেরু তুষারের ক্ষয়, সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রভৃতি। তা প্রতিরোধের পাশাপাশি পরিবর্তিত পরিমণ্ডলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গটিও অবধারিতভাবে এসে পড়ছে। UNFCC এবং কিয়োটো আচরণবিধি (Protocol)-র প্রতি দায়বদ্ধ ভারত। এই দু'টি বিধিই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার

২০২৪-র মধ্যে বাতাসে PM 10 এবং PM 2.5-এর ঘনত্ব অন্তত ৩০ শতাংশ কমাতে সরকার হাতে নিয়েছে জাতীয় পরিচ্ছন্ন বায়ু কর্মসূচি (National Clean Air Programme—NCAP)। নজরদারির মাধ্যমে সারা দেশে বাতাসের গুণগত উৎকর্ষ যতটা সম্ভব বজায় রাখা এবং প্রয়োজনীয় সচেনতার ও ব্যবস্থাপনার প্রসারও এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত। বিস্তারিত এই বিধিসমূহে আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিশেষ করে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং পরিবেশ-বান্ধব বিভিন্ন পন্থা ও প্রণালীর কথা বলা হয়েছে।

২০১৬-র ২ অক্টোবর ভারত প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ওই চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় বিশ্বের দেশগুলিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রেখে জরুরিভিত্তিতে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-তেই প্যারিস বোঝাপড়ায় সম্মতি জানায় ১৯৫-টি দেশ (গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণের নিরিখে শীর্ষে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে)। ২০১৫-র খসড়া মোতাবেক শিল্পায়ন পূর্ববর্তী সময়ের তাপমানকে ভিত্তি স্তর ধরে উষ্ণায়নের মাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে রাখার কথা বলা হয়েছিল। ২০১৭-র ১২ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় অভিন্ন গ্রহ শিখর সম্মেলন---One Planet Summit। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় নাগরিক সমাজ, বেসরকারি ক্ষেত্র এবং জাতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের প্রসঙ্গ উঠে আসে। প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উৎসের কথা বলা হয় সেখানে। ৬০-টি দেশের সরকার প্রধান এবং বাণিজ্য জগতের নেতৃস্থানীয়রা জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্রয়াসী হওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। উষ্ণায়ন-সহ অন্য হানিকর প্রবণতা এড়াতে প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বিশ্ব জলবায়ু তহবিল (Global Climate Fund—GCF)-এ টাকা দেওয়ায় দায়বদ্ধতার কথা জানিয়েছে জাপান। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো পরিবেশগত প্রশ্নে স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলির দিকে লক্ষ্য রাখছে ওই দেশ। পরিবেশ-বান্ধব শক্তির ব্যবহার বাড়াতে সম্মেলনে ২০১৯-এর পর থেকে তেল ও গ্যাস উত্তোলনে ঋণ কিংবা অর্থসহায়তা দেওয়া বন্ধ করার কথা জানায় বিশ্ব ব্যাঙ্ক।

এত কিছু সত্ত্বেও এখনও অনেক কাজ বাকি। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-র প্রতিবেদন বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরমতম বিপর্যয় এড়াতে যতটা উদ্যোগ জরুরি, প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালিত হলেও তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র পূরণ হওয়া সম্ভব। দেশগুলির 'জাতীয় স্তরে গৃহীত লক্ষ্য' (NDC) মোতাবেক পুরো কাজ হলেও ২১০০ সাল নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা অন্তত ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। সুতরাং, ২০২০-তে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় আরও অনেক কিছু উদ্যোগ এবং তার রূপায়ণের সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে দেশগুলিকে।

২০১৫-এ ভারত জাতীয় স্তরে নির্ধারিত অবদান কর্মসূচি (Intented Nationally Determined Contribution—INDC)-র ঘোষণা করে। এর আওতায় ২০২২ নাগাদ দেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৭৫ GW রাখা হয়েছে (এর মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ ১০০ GW এবং বায়ুবিদ্যুৎ ৭৫ GW)। ২০৩০ নাগাদ অজীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের বর্তমান ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশে নিয়ে যেতে চায় ভারত। ওই সময়ের মধ্যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে কার্বন নিঃসরণ ৩৩ থেকে ৩৫ শতাংশ কমানো এবং বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি করে আরও ২৫০ কোটি থেকে ৩০০ কোটি টন কার্বন শোষণের (Carbon Sink) পরিমণ্ডল তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রাও নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে (অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৯) অনুষ্ঠিত জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা শিখর সম্মেলনে (Climate Action Summit) প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ২০২২-এ পরিবেশ-বান্ধব পন্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৭৫ GW পরিমাণে নিয়ে যাবে ভারত। ক্রমে তা বাড়িয়ে করা হবে ৪৫০ GW। প্যারিস চুক্তির আওতায় ভারতের কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, ৫১-টি সংস্থার ৮০ শতাংশ কার্বন নির্গমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকল্প (Carbon Disclosure Project)-এ সাড়া দিচ্ছে। ২০১৭-এ আরও

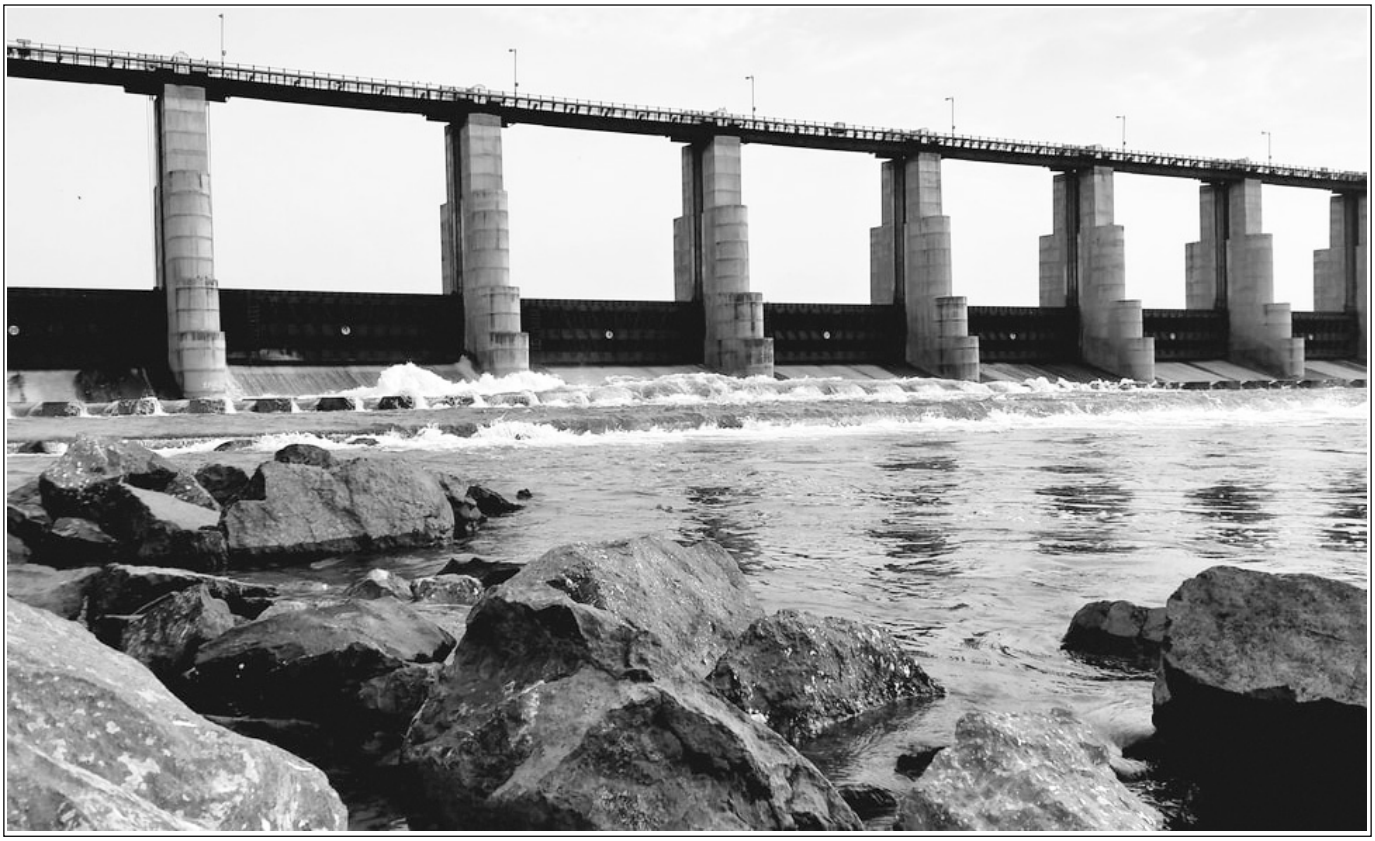

এক ধরনের কার্বন নিঃসরণ রোধ উদ্যোগের উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতের এসংক্রান্ত প্রয়াসের মধ্যে। দেখা গেছে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির চল্লিশ শতাংশ পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ। তিনটি সংস্থা যেভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাতে তাদের কাজকর্মের সবটাই অদূর ভবিষ্যতে হবে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস-নির্ভর। অভ্যন্তরীণ কার্বন মূল্যায়ন (Internal Carbon Pricing—ICP) পদ্ধতি গ্রহণ করছে একের পর এক ভারতীয় বাণিজ্য সংস্থা। ICP কার্বন নির্গমণ কমানোর সহায়ক পন্থাকে জোরদার করে। ভারতে মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড—CO_2 হ্রাসে ২ শতাংশ অবদান রেখেছে মাত্র ৪৭৮-টি সংস্থা।(৪) ভারতে ২০১৮ সালের CDP বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৩-টি সংস্থা ICP পদ্ধতি ব্যবহার করছে এবং ২৪-টি সংস্থা এসংক্রান্ত উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৭-এ ওই সংখ্যা দু'টি ছিল যথাক্রমে ১১ এবং ২০। ২০১৯-এ ICP-কার্যকর করার লক্ষ্যে এগিয়েছে ৩৭-টি সংস্থা। এর মধ্যে বড়ো একটি সিমেন্ট উৎপাদক সংস্থাও রয়েছে।(৫)

দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যকর উদ্যোগ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণ কমাবে অনেকটাই। শিল্পসংস্থাগুলির ওপর নজরদারির জন্য চাই একটি তৎপর ব্যবস্থা। পরিবেশ দূষণ রোধের উদ্যোগের পাশাপাশি প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামোকে জোরদার করে তোলা। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলির কর্মীসংখ্যা অপ্রতুল। পরিকাঠামোও অপর্যাপ্ত বহুলাংশেই। ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে কর্মীসংখ্যা কয়েকশো মাত্র। সেখানে মার্কিন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থায় কর্মরত ১৪ হাজার কর্মী। পরিবেশবিজ্ঞানীর সংখ্যা তো আরও অনেক কম![৬] রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলির অবস্থা আরও খারাপ। দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ৩০-এরও কম। মেক্সিকো সিটি-র সমধর্মী সংস্থায় সংখ্যাটি ২০০-র বেশি।(৭)

ভারতের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামোকে আরও অনেক জোরদার করে তোলা এই সময়ের দাবি। চাই গবেষণা এবং এসংক্রান্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) What the economy needs now. Edit. Abhijit Banerjee et al. Juggernaut, New Delhi, 2019.

(২) Environmental concern amidst industrialisation. Samar Lahiry. Down To Earth, 14 March, 2017.

(৩) https://sun-connect-news.org/fileadmin/DATEIEN/Dateien/New/Solar-Rooftop-Replacing-Diesel-Generators-in-Residential-Societies.pdf. Accessed on 10 December, 2019.

(৪) India's report on climate plan. Times of India, 25 October, 2017.

(৫) Rastogi, 2019.

(৬) The Environment and Climate Change. E. Somanathan in What the economy needs now, Edit. Abhijit Banerjee et al. Juggernaut, New Delhi, 2019.

(৭) Mission 80-80-80 : A five-step roadmap for cutting pollution. Arunabha Ghosh. Times of India, 8 December, 2019.

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ইমারত ও সড়ক নির্মাণে বর্জ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার

অশোক জি. মাতানি

পুরনো বর্জ্য প্লাস্টিক গলিয়ে অন্য কাজে লাগালে জলে-ডাঙায় যত্রতত্র প্লাস্টিক জমে থাকার হাত থেকে রেহাই মিলতে পারে। এধরনের বর্জ্যকে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বেশকিছু দিন ধরেই। প্লাস্টিক বর্জ্যকে উপকরণ হিসেবে কাজে লাগিয়ে তৈরি সড়ক টেঁকসই হয় বেশি। সমুদ্রে ভেসে থাকা বর্জ্য প্লাস্টিক রাস্তা তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে নেদারল্যান্ডসে। এই ধরনের রাস্তার মেয়াদ হয় বছর পঞ্চাশেক, যা চিরাচরিত পদ্ধতিতে তৈরি সড়কের মেয়াদের প্রায় তিনগুণ। প্রচণ্ড গরম, ঠাণ্ডা এবং সব ধরনের আবহাওয়াতে মানিয়ে নিতে পারে এই রাস্তা।

যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে যত্রতত্র পড়ে থাকা প্লাস্টিকের সামগ্রী ক্ষতি করে পরিবেশের। নেতিবাচক প্রভাব পড়ে গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ওপরে। মনে রাখতে হবে যে বর্তমান যুগে প্লাস্টিক এক অপরিহার্য জিনিস, কিন্তু তা প্রস্তুত হয় প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর নানা যৌগ দিয়ে। পচনশীল না হওয়ায় তা অক্ষত থেকে যায় দীর্ঘদিন। ফলে সমস্যা বাড়ে আরও।

পুরনো অব্যবহার্য প্লাস্টিকের জিনিস গলিয়ে ফেলে অন্য কাজে লাগানো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি দিক। জলে-স্থলে সর্বত্র ইতিউতি পড়ে থাকা প্লাস্টিক পরিবেশের প্রশ্নে বড়ো আপদও বটে। বর্জ্যের স্তূপ থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিককে রাস্তা তৈরির কাজে লাগানোর উদ্যোগ চোখে পড়ছে এখন। 'প্লাস্টিক সড়ক' আদতে হল বর্জ্য প্লাস্টিকের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পাওয়া দ্রব্যকে কাজে লাগিয়ে তৈরি রাস্তা। এক্ষেত্রে, চিরাচরিত সড়ক নির্মাণ ব্যবস্থার তুলনায় কার্বন নিঃসরণ হয় কম। 'প্লাস্টিক সড়ক' বেশ মজবুত হওয়ায় টেঁকেও বেশি দিন।

রাস্তা তৈরিতে, বিশেষত, ৫ লক্ষ কিংবা তার বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহুরে জনপদের ৫০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে মহাসড়ক নির্মাণে বর্জ্য প্লাস্টিকের ব্যবহারে জোর দিচ্ছে ভারত সরকার। এই ধরনের বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেনতার প্রসারে প্রায় ২৬ হাজার মানুষকে কাজে লাগাচ্ছে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক। বর্জ্য প্লাস্টিক সংগ্রহের লক্ষ্যে সূচনা হয়েছে ৬১ হাজার ঘণ্টার শ্রমদান কর্মসূচির। এর ফলে সারা দেশে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ১৮ হাজার কিলোগ্রাম প্লাস্টিক বর্জ্য। প্রতি ১০ টন শিলাজতু (asphalt) বা পিচ তৈরিতে লাগে প্লাস্টিকের ৭১,৪৩২-টি বোতল কিংবা ৪,৩৫,৫৯২-টি থলে।

যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে এখানে-সেখানে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের সামগ্রী ক্ষতি করে পরিবেশের। নেতিবাচক প্রভাব পড়ে গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ওপরে। মনে রাখতে হবে যে প্লাস্টিক খুবই কাজের জিনিস, কিন্তু তা তৈরি হয় প্রাণির স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর নানা যৌগ দিয়ে। পচনশীল না হওয়ায় তা অক্ষত থেকে যায় দীর্ঘদিন। ফলে সমস্যা বাড়ে আরও। আলোক বিয়োজন বা Photo-decomposition-এর ফলে তার থেকে বেরিয়ে আসা বিষাক্ত পদার্থ দূষিত করে মাটি ও জলকে।[১]

পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বর্জ্য ও আবর্জনা। ব্যস্ত জীবনযাপন তৈরি করছে একবার ব্যবহারের পরই বাতিলযোগ্য জিনিসের চাহিদা। এই বাতিল হয়ে যাওয়া জিনিস চারপাশে জমা হচ্ছে

[লেখক মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর Govt. College of Engineering-এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। ই-মেল : dragmatani@gmail.com]

ক্রমাগত। ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে প্লাস্টিক দূষণ।[২]

পুরনো বর্জ্য প্লাস্টিক গলিয়ে অন্য কাজে লাগালে জলে-ডাঙায় যত্রতত্র প্লাস্টিক জমে থাকার হাত থেকে রেহাই মিলতে পারে। এধরনের বর্জ্যকে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বেশকিছু দিন ধরেই। প্লাস্টিক বর্জ্যকে উপকরণ হিসেবে কাজে লাগিয়ে তৈরি সড়ক টেঁকসই হয় বেশি। সমুদ্রে ভেসে থাকা বর্জ্য প্লাস্টিক রাস্তা তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে নেদারল্যান্ডসে। এই ধরনের রাস্তার মেয়াদ হয় বছর পঞ্চাশেক, যা চিরাচরিত পদ্ধতিতে তৈরি সড়কের মেয়াদের প্রায় তিনগুণ। প্রচণ্ড গরম, ঠাণ্ডা এবং সব ধরনের আবহাওয়াতে মানিয়ে নিতে পারে এই রাস্তা। ব্রিটেনে, একটা গোটা কারখানা আছে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে রাস্তা তৈরির প্রয়োজনীয় জতুশিলা (asphalt) উৎপাদনের জন্য।

ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের আওতাধীন গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গ্রামের রাস্তা তৈরিতে বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। গ্রামের রাস্তা তৈরিতে এই ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করা যেতে পারে :

- ফিলম্ (ক্যারি ব্যাগ, কাপ)। এক্ষেত্রে ব্যবহার্য ফিলম্ ৬০ মাইক্রন পর্যন্ত পুরু হতে পারে (PE, PP এবং PS)।
- Hard foams, তা যেকোনও ঘনত্বের হতে পারে।
- Soft foams, তা যেকোনও ঘনত্বের হতে পারে।
- বিস্কুট, চকলেটের প্যাকেজিং-এ ব্যবহৃত ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক। এক্ষেত্রে ৬০ মাইক্রন পর্যন্ত পুরু প্লাস্টিক ব্যবহারযোগ্য।

PVC চাদর (শিট) বা Flux এক্ষেত্রে কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। আর, বর্জ্য প্লাস্টিক কাটার যন্ত্র (modifier) হওয়া উচিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্লাস্টিক খণ্ডের আয়তন থাকবে ২-৩ মিলিমিটারের মধ্যে। কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Central Road Research Institute—CRRI)-এর নির্দেশিকায় বলা আছে যে, খণ্ডবিখণ্ড প্লাস্টিকের টুকরোগুলি ৩ মিলিমিটার ছিদ্র-বিশিষ্ট ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে যেন গলে যায়।

রাস্তা পাতার (laying) প্রণালী

'প্লাস্টিক সড়ক' তৈরির ক্ষেত্রে শিলাজতু (bitumen) মিশ্রণে ৮ শতাংশ প্লাস্টিক থাকার সুপারিশ করেছে CRRI। চিরাচরিত ৬০/৭০ কিংবা ৮০/১০০ পর্যায়ের শিলাজতু ব্যবহার করা যেতে পারে।[৩]

ছোটো তপ্ত মিশ্রণ বা 'হট মিক্স' যন্ত্রের ক্ষেত্রে

প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিশ্রিত শিলাচূর্ণ চোঙাকৃতি আধারে (mix cylinder) রেখে ১৬৫°C মাত্রার তাপ প্রয়োগ করা হয়। এর পর তা স্থানান্তরিত করা হয় তরল মিশ্রণ আধারে (Puddler)। এক্ষেত্রে তাপমান-এর ওপর নজরদারি চালানো হয় মাপক যন্ত্রের (IR thermometer) সাহায্যে। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ওই মিশ্রণে ছড়িয়ে দেওয়া হয় প্লাস্টিকের ছোটো খণ্ড। সেই প্লাস্টিক গলে গিয়ে তৈরি হয় তৈলাক্ত একটি আবরণ।

অন্যদিকে, শিলাজতু মিশ্রণ আলাদা পাত্রে রেখে ১৬০°C মাত্রার তাপ প্রয়োগ করা হয়। তারপর ওই প্লাস্টিক আবরণযুক্ত শিলাচূর্ণের ওপর ফেলা হয় গরম শিলাজতু। এই পদ্ধতিতে তৈরি মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় রাস্তা পাতার কাজে। ওই কাজের সময় মিশ্রণের উত্তাপ থাকে ১১০ থেকে ১২০°C-এর মধ্যে।

লব্ধ অভিজ্ঞতা

শিলাজতুর সঙ্গে প্লাস্টিকের মিশ্রণে তৈরি রাস্তা মসৃণতর এবং টেঁকসই। তা ব্যয়সাশ্রয়ী

বর্তমানে যেভাবে প্লাস্টিক উৎপাদন, ব্যবহার এবং ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয় তা পরিবেশ রক্ষা ও ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রশ্নে হানিকর। বন্যপ্রাণ এবং মানুষের বিপদ ডেকে আনছে প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার। এই সমস্যার ধরন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যাদি রয়েছে আমাদের কাছে। তবে আরও সচেনতা প্রয়োজন। প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনেকখানি। দরকার পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়াকরণের জোরদার উদ্যোগ। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রাখতে হবে সরকারকে। চাই গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।

এবং পরিবেশ-বান্ধবও বটে। প্লাস্টিক মিশ্রিত হলে শিলাজতু বা bitumen-এর গুণগত উৎকর্ষও বাড়ে। এধরনের রাস্তার জলের সংস্পর্শজনিত ক্ষয়ও কম। তাছাড়া রাস্তা তৈরিতে প্রয়োজনীয় শিলাজতুর পরিমাণও ১০ শতাংশ কম লাগে এক্ষেত্রে।

'প্লাস্টিক যুগ' শেষ হতে অনেক দেরি। এই জিনিসটিকে কাজে লাগানোর সুযোগ এখনও প্রচুর। বিজ্ঞান গবেষণা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, যানবাহন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন, সব ক্ষেত্রেই প্লাস্টিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে দূষণ রোধেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে প্লাস্টিক।[৪]

ভারত সরকারের 'স্বচ্ছতাই সেবা' কর্মসূচির আওতায় জনসভা, বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে রাস্তাঘাট থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য তুলে এনে অন্য কাজে লাগানোয় উদ্যোগী হতে আহ্বান জানানো হচ্ছে মানুষকে। ট্রাক চালক এবং সড়ক মাশুল আদায় কেন্দ্রের (Toll Plaza) কর্মীদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার কমাতে চায় সরকার। বর্জ্য পৃথকীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হচ্ছে প্রয়োজনীয় পাত্র। বিলোনো হচ্ছে চটের বা কাপড়ের ব্যাগ। ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ধওলা কুঁয়া এলাকায় রাস্তার একটি অংশ তৈরি করা হয়েছে বর্জ্য প্লাস্টিকের ব্যবহারের মাধ্যমে। দিল্লি-মিরাট এক্সপ্রেসওয়ে এবং গুরুগ্রাম-সোহনা সড়কের অংশবিশেষও বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

আগামী দিনে মানুষের আরও কাজে লাগতে পারে প্লাস্টিক।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Gawande, A.P. Economics and viability of plastic road : A review, Journal of Current. Chemical Pharmaceutical Sciences, 3(4), 2013, pp. 231-242.

(২) Song J.H., Murphy R.J., Narayan R., Davies G.B.H. Biodegradable and compostable alternatives to conventional plastics. Phil. Trans. R. Soc. B 364, 2009, 2127-2139.

(৩) Hopewell J., Dvorak R., Kosior E. Plastics recycling: challenges and opportunities. *Phil. Trans. R. Soc.* B 364, 2009, 2115–2126.

(৪) Hu G.X., Lian Q.Q., Ge R.S., Hardy D.O., Li X.K. Phthalate-induced testicular dysgenesis syndrome: Leydig cell influence. *Trends Endocrinol. Metab.* 20, 2009, pp. 139-145.

(৫) Tugov, A.N. Experience of using municipal solid waste in the energy industry (An Overview), *Thermal Engineering*, 62(2), 2015, pp. 853-861.

(৬) Anastas P.T., Crabtree R.H., editors. (ed.), Handbook of green chemistry—green catalysis. Vol I Homogenous catalysis. Handbook of Green Chemistry, New York, NY : John Wiley & Sons, 2009.

(৮) Trushin, B.V. Ecological safety and energetic potential of solid domestic waste of Moscow region, *Tverdye Bytovye Otkhody*, 9(3), 2014, pp. 8-10.

(৮) Bolden J. et al. Utilization of Recycled and Waste Materials in Various Construction Applications, *American Journal of Environmental Science*, 9(1), 2013, pp. 14-24.

(৯) Dharaskar, Rajiv V. Innovation-Growth Engine for Nation-Nice Buzzword but Often Misunderstood, Shroff Publishers & Distributors Pvt. Ltd., New Delhi, 2014, pp. 12-24.

(১০) Matani, A.G., Doifode, S. K. Effective industrial waste utilization technologies towards cleaner environment, *International Journal of Chemical and Physical Sciences*, 491(1), 2015, pp. 536-540.

(১১) Matani, A.G. Strategies for better waste management in industrial estates, *Journal of Industrial Pollution Control*, 22(1), 2006, pp. 67-72.

(১২) Doifode, S.K., Matani, A.G. Advanced environment protection techniques by industries: potential for corporate social responsibility activities, *Journal of The International Association of Advanced Technology and Science*, 15(3), 2015, pp. 1-8. Gregory M.R. Environmental implications of plastic debris in marine settings—entanglement, ingestion, smothering, hangers-on, hitch-hiking and alien invasions, *Phil. Trans. R. Soc.* B 364, 2009, pp. 2013-2025.

(১৩) Koch H.M., Calafat A.M. Human body burdens of chemicals used in plastic manufacture. *Phil. Trans. R. Soc.* B 364, 2009, 2063-2078.

(১৪) Bolden J., Abu-Lebdeh T., Fini E. Utilization of recycled and waste materials in various construction applications, *American Journal of Environmental Sciences,* 9(4), 2015, pp. 14-24.

সহায়ক সূত্র :

- Ahmed M.M. and Raju S.S. Use of Waste Plastic in the Production of Light Weight Concrete, *International Journal & Magazine of Engineering, Technology, Management and Research*, 2(4), 2015, pp. 365-369.
- Afroz Sultana S K, K.S.B. Prasad, Utilization of waste plastic as a strength modifier in surface course of flexible and rigid pavements, *International Journal of Engineering Research and Applications* , 2(4), 2012, pp.1185-1191
- https://www.tce.edu/sites/default/files/ PDF/Plastic-Roads-Guidelines.pdf
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC2873021/

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

একান্ত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথন

সরকার, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন সরকার, জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব-সহকারে দেখছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (COP, মাদ্রিদ) এসব ইস্যুতে বিভিন্ন দেশ ঐক্যমতে পৌঁছতে পারবে বলেও আমার বিশ্বাস। শুধুমাত্র ভারত বা ইউরেশিয়া বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই নয় বিশ্বের সকল দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত হওয়া দরকার যে এই গ্রহ আমাদেরই। প্রতিটি মানুষকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, এই গ্রহই আমাদের একমাত্র আশ্রয়ের জায়গা যাকে জলবায়ু বা অন্য ধরনের পরিবর্তনের প্রকোপ থেকে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য...ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে এটাও মনে করা স্বাভাবিক যে আমাদের জীবন তথা আমাদের এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যে বহুলাংশে জলবায়ুর গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, তা নিয়েও জনচেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজের অগ্রগতি প্রত্যাশামতো হচ্ছে না তার কারণ হল শক্তি ব্যবহারের সর্বব্যাপিতা।

সবুজ বিপ্লবের জনক মনকোমবু সম্বাশিবান স্বামীনাথন আমাদের কাছে অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথন নামে বেশি পরিচিত। গত ১১ ডিসেম্বরের এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে তার অফিসে পৌঁছিয়ে পেলাম সাদর অভ্যর্থনা। গোড়াতেই গত শতকের ষাটের দশকে সারদা প্রসাদ সম্পাদিত 'যোজনা' পত্রিকার সঙ্গে তার নিবিড় সংস্রবের কথা অধ্যাপক স্বামীনাথন উল্লেখ করলেন। জানালেন অতীতের ওই বছরগুলিতে যোজনা-র প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় তার লেখা প্রকাশিত হ'ত। নিজ নামাঙ্কিত গবেষণা ফাউন্ডেসনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক স্বামীনাথন এখন হুইল চেয়ার আশ্রয়ী হলেও তার সজাগ ও বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনার ফসল হিসাবে ওই দিনের কথোপকথনে প্রাধান্য পেল সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়নের প্রসার, সাধারণ কৃষিজীবীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান পরামর্শ।

অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথনের সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ। চেন্নাইস্থিত 'যোজনা'-র প্রতিনিধি সঞ্জয় ঘোষ এই একান্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন।

● জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এই পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস পালটানো জরুরি হয়ে উঠেছে। কীভাবে অভ্যাস বদলানো সম্ভব হতে পারে?

তিনটি স্তরে এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। প্রথমত, পারিবারিক স্তরে যেখানে মায়েদের ভূমিকা খুব বড়ো। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে। তৃতীয় স্তরে রয়েছে সমাজজীবনের ভূমিকা, যেখানে সবার আগে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যে তারা পরিবেশের প্রশ্নে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করবেন না। সুতরাং পরিবর্তনসাধনে পারিবারিক স্তর, স্কুল-কলেজের শিক্ষা এবং সর্বোপরি জনজীবন বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন— এই তিনটি স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এসব নিয়ে আমাদের দেশে সুসংগঠিত জনশিক্ষা কর্মসূচির অভাব লক্ষ্য করা যায়।

একটি প্রয়াস এখানে উল্লেখযোগ্য। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছেন। তবে সমস্যাটি নিয়ে স্কুল, কলেজ বা বাড়িতে তেমন চর্চা হয় না। প্রয়োজন না থাকলেও বাড়িতে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র চালাতে আমাদের দ্বিধা হয় না। এটা ভুলে যাই যে আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রতি ইউনিট শক্তি সর্বতোভাবে অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে প্রসারিত করার গুরুত্ব এখানেই এবং এই শক্তির ব্যবস্থাপনায় পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, শহরাঞ্চলীয় প্রয়াস অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন। জনচেতনা গড়ে তুলতে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরেই নিতে হবে একাধিক পদক্ষেপ। আমি চাই প্রতিটি পঞ্চায়েতেই একটি করে জলবায়ু ব্যবস্থাপনা

সমিতি স্থাপিত হোক। পঞ্চায়েত সদস্যদের এই বিষয়ে সুশিক্ষিত করতে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে।

● জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় সরকারি স্তরে একাধিক নীতি ও কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। আর কী কী করণীয়?

একদিক থেকে বিচার করলে আমরা অভিনবত্ব দাবি করতে পারি। তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েতি প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য স্তরে আইনসভা কমিটি ইত্যাদি থাকায় আমাদের গণতন্ত্র এখন অনেকটা প্রাণবন্ত। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের রয়েছে অগণিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়। রাজনৈতিক স্তরে রয়েছে গ্রামসভা থেকে শুরু করে সংসদ। এসব আছে বলেই জনশিক্ষায় সকলকে জড়িত করার বিষয়টি বড়ো হয়ে উঠেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন নয়, আমাদের সকলেরই উপলব্ধি করতে হবে যে জলবায়ুর বিষয়টি ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ভেদাভেদ করে না। একমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই শক্তি ব্যবহার করে তার নিজের কক্ষের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। আমি মনে করি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে জলবায়ুর সমস্যা সমাধানে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সমবেত প্রয়াস নেবার এটাই আদর্শ সময়। ১৯৮৯ সালে আমাদের দেশে জলবায়ু বিষয়ক MSSRF গবেষণা কাজের সূচনা হয়েছিল। এর সুফল হিসাবে বিগত তিন দশকে একাধিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গোড়ার দিকে ছিল এক ধরনের নিস্পৃহতার মানসিকতা। এখন কিন্তু অবস্থাটা পালটাচ্ছে। আমি মনে করি একটি উচ্চ কার্বন সমাজ থেকে নিম্ন কার্বন সমাজে পৌঁছনোর প্রক্রিয়ায় আমরা গতি আনতে পেরেছি। দেশের সার্বিক হিতের কথা ভেবেই এই উত্তরণ আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে।

● এই উত্তরণপর্ব কি দীর্ঘ সময় নিচ্ছে?

ঠিক তাই, একটু আগেও আমি একথা বলতে চেয়েছি। তাত্ত্বিক দিক থেকে দেশের মানুষ জলবায়ুর সমস্যা সম্পর্কে অবহিত। জলবায়ুর অবস্থা পরিমাপ করার জন্য আমরাই প্রথম ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) সাহায্য নিয়েছি, কারণ আমাদের দেশ মূলত কৃষিভিত্তিক। Photosynthesis বা সালোকসংশ্লেষের দরুন কৃষিকাজই হচ্ছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রধান উৎস। উদাহরণ দিয়ে বলি, দক্ষিণ ভারতের মানুষ পোঙ্গাল উৎসবে সূর্য এবং সবুজ গাছপালার উপাসনা করে থাকেন। সূর্য উপাসনার নেপথ্যে রয়েছে এই স্বীকৃত সত্য যে সবুজ গাছপালা সূর্যালোক শোষণ করার ফলেই শক্তির রূপান্তর ঘটে। প্রকৃত জ্ঞানের এটাই তো সুউচ্চ পর্যায়। পোঙ্গালের অর্থ কী বা কেনই বা তার উপাসনায় ইক্ষুকে বেছে নেওয়া হয়, এটা আমি অনেক সময় লোকজনের কাছে জানতে চেয়েছি। এরা জানেন না যে সৌরশক্তি আহরণে ইক্ষুর সমতুল আর কিছুই নয়।

তাই আমার মনে হয় রূপান্তর পর্বের এখন সূত্রপাত হয়েছে এবং সরকার, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন সরকার, জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব-সহকারে দেখছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (COP, মাদ্রিদ) এসব ইস্যুতে বিভিন্ন দেশ ঐক্যমতে পৌঁছতে পারবে বলেও আমার বিশ্বাস। শুধুমাত্র ভারত বা ইউরেশিয়া বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই নয় বিশ্বের সকল দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত হওয়া দরকার যে এই গ্রহ আমাদেরই। প্রতিটি মানুষকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, এই গ্রহই আমাদের একমাত্র আশ্রয়ের জায়গা যাকে জলবায়ু বা অন্য ধরনের পরিবর্তনের প্রকোপ থেকে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

সূচনা হয়েছে ঠিকই তবে কাজের গতিতে আমি আদৌ সন্তুষ্ট নই। পাশাপাশি ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে এটাও মনে করা স্বাভাবিক যে আমাদের জীবন তথা আমাদের এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যে বহুলাংশে জলবায়ুর

গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, তা নিয়েও জনচেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজের অগ্রগতি প্রত্যাশামতো হচ্ছে না তার কারণ হল শক্তি ব্যবহারের সর্বব্যাপিতা। এই ঘরে যে আলো জ্বলছে সেটাতেও শক্তির প্রয়োজন। অতএব বেশি মাত্রায় কার্বন সৃষ্টিকারী প্রতিটি কর্মের বিকল্প পন্থা গড়ে তুলতে পারলে নিঃসন্দেহে আমাদের অগ্রগতি দ্রুততর হবে। উদাহরণস্বরূপ ধূম্রহীন চুলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র প্রয়াস হলেও এই চুলার ব্যবহার খুবই সময়োপযোগী। এভাবে আরও অনেক প্রয়াস নিতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে। আগামী দশ বছরে হয় তো বিশেষ কিছু হবে না; তবে বিশ বছর পর সুফল আসবেই। এই সময়পর্বেই যে আজকের শিশুরা বড়ো হতে চলেছে একথা ভুলে গিয়ে কখনওই আমাদের আত্মতুষ্ট হলে চলবে না।

● সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ফসল কাটার পরবর্তী ধাপে নাড়া পোড়ানোর কারণে দিল্লিতে বায়ুদূষণের সমস্যা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে সরকারের কী করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

পাঞ্জাবে গম ও ধান চাষের পর্যায়ক্রমের সঙ্গে এই নাড়া পোড়ানোর বিষয়টি জড়িত। আমি নিজেই গোড়া থেকে এটা প্রত্যক্ষ করেছি। বিভিন্ন প্রজাতির ধান সাধারণত খুব দীর্ঘ হয়। সেপ্টেম্বর/অক্টোবর নাগাদ ধান কাটতেই হবে, কেন না এর অব্যবহিত পরই সঠিক সময়ে গমের চারা রোপণ করতে হবে, অন্যথায় গম চাষ মার খাবে। এই অবস্থায় আমার সুপারিশ ছিল একমাত্র সেই প্রজাতির ধান চাষ করা হোক যা থেকে অনেক আগেই ফসল তোলা সম্ভব হবে।... যাই হোক না কেন পাঞ্জাবে এখন সম্পূর্ণ নতুন এক শস্য পর্যায়ক্রম অনুসৃত হচ্ছে। যেখানেই এই ধান ও গম চাষের পর্যায়ক্রম রয়েছে সেখানে ধান জৈব উদ্যান (Rice Bio Park) থাকাটা আবশ্যিক। এই জৈব উদ্যানে ধানের প্রতিটি অংশের, যেমন, গাছড়া, খড়কুটা, খোসা, ভুষি, পাতা, সব কিছুকে কাজে লাগাতে হবে। এগুলির প্রতিটিরই সদ্ব্যবহার সম্ভব। আমার বক্তব্য হল এগুলির আর্থিক সম্ভাবনা সম্পর্কে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। দক্ষিণ ভারতে খড়কুটা পোড়ানো হয় না। ছোটোবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়িতে তিন-চারটি গরু ছিল এবং গরুর খাদ্যের উপকরণ হিসাবে খড় ব্যবহার করা হ'ত। খড়ের এই আর্থিক মূল্য থাকার কারণেই আমার মা একটি খড়েরও অপরচয় করতে দিতেন না। অন্যদিকে নাড়ার যথেষ্ট আর্থিক মূল্য থাকা সত্ত্বেও আজকের দিনে কৃষকরা সেসব পোড়াচ্ছেন। আমি রাজস্থান সরকারকে চিঠি লিখে জানাই যে তাদের রাজ্যে গবাদি পশুসম্পদ থাকলেও প্রায়শই সেগুলি অপুষ্টির শিকার। পাঞ্জাব রাজ্যের প্রতিবেশি হিসাবে রাজস্থান উপকৃত হতে পারে, যদি তারা পাঞ্জাব থেকে অর্থের বিনিময়ে নাড়া কিনে তা থেকে নিজেদের জন্য গবাদি পশু খাদ্য তৈরি করতে পারে। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভালো কিছু করার চিন্তাভাবনা অনেক সময় কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। অবশ্য আমার কয়েকটি সুপ্রস্তাব খুব দ্রুত গৃহীতও হয়েছে। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে ফসল ব্যবস্থার পরিবর্তনের নিরিখে কৃষকদের এমন প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করতে হবে যাতে তারা নিজেরাই ধানচাষের জমিতে ফসল তোলার পর খড়জাতীয় পরিত্যক্ত সামগ্রীকে বাড়তি আয়ের উৎসে পরিণত করতে পারেন।

সোজা কথা হল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বলি, প্রাচীন যুগে তামিলনাড়ুতে পার্বত্য, বনাঞ্চলীয়, বৃষ্টিধৌত, উপকূলবর্তী এবং মরু এলাকার প্রাকৃতিক ভেদাভেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঁচ ধরনের চাষ প্রথা অনুসরণ করা হ'ত। প্রতিটির ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র পদ্ধতি। আমার মনে হয় সেই প্রথাই ফেরার পথে। সমস্যা হলে সবাই চাষিদেরই দায়ি করে থাকেন। চাষিরা কিন্তু আদতে উৎপাদক। ধান উৎপাদনে তাদের অবদানের জন্যই থাইল্যান্ডকে ছাড়িয়ে গিয়ে আমরা এখন বিশ্বে এক নম্বর স্থানে পৌঁছেছি। সুতরাং কৃষকদের দোষত্রুটি দেখলে হবে না। যেটা দরকার তা হল ধানচাষ পরবর্তী এই নাড়ার সদ্ব্যবহার করেই গবাদি পশুর জন্য ক্যালরি ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়া চাষিদের কাছেও বাড়তি আয়ের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমি যখন ফিলিপিন্সস্থিত আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা সংস্থার (International Rice Research Institute) দায়িত্বে, তখন সে দেশের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি কোরি অ্যাকিনো একবার আমাদের সংস্থার ধান সম্পর্কিত জৈব উদ্যান দেখতে এলেন। ধানজাত একটি

সুন্দর স্ট পেপার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটির দাম জানার পর তিনি তৎক্ষণাত এধরনের সামগ্রীর হাজারটি ক্রিসমাস কার্ড তৈরির বরাত দিলেন।

কারও যদি এধরনের খড়কুটা থাকে এবং তা থেকে অনায়াসেই তিনি টনপিছু হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই সেই খড়কুটা তিনি পুড়িয়ে নষ্ট করবেন না। স্বভাবতই তিনি এই খড়কুটা পার্শ্ববর্তী রাজস্থানে পাঠাবেন যেখানে তা দিয়ে সহজেই পশুখাদ্য তৈরি হতে পারে। মনে রাখতে হবে এই খড়কুটাই কাগজ, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি বানানোর প্রধান কাঁচামাল, আবার এথেকেই পুনর্বার সার তৈরি করে বাড়ানো সম্ভব মৃত্তিকার উর্বরতা। আর্থিক সম্ভাবনার এসব দিক খতিয়ে দেখলে কৃষকরা কখনওই খড়কুটা পোড়াতে যাবেন না। তাই এই খড়কুটার আর্থিক মূল্য সম্পর্কে যথোচিত প্রচার ও তথ্য পরিবেশনের আবশ্যকতা রয়েছে।

● সরকারি প্রয়াসে কী ধরনের প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কৃষকদের নিরস্ত করা সম্ভব হতে পারে?

দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি আমাদের দেশে জটিল ও সময়সাপেক্ষ। আমাদের এখানে কৃষি রাজ্য তালিকাভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে রয়েছে নীতি নির্ধারণের মতো বড়ো বড়ো বিষয়। গ্রাম স্তরে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ এজেন্সি। এইসব দিক খতিয়ে দেখার পর ১৯৭২ সালে আমি কৃষি বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনায় উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আমার এই প্রয়াস ফলপ্রসূ হলেও এখন দরকার প্রতিটি পঞ্চায়েতে অন্তত একটি করে জলবায়ু ব্যবস্থাপনা ইউনিট গড়ে তোলা এবং নাড়া পোড়ানোর সমস্যাটিকে জলবায়ু ব্যবস্থাপনা অ্যাজেন্ডার সঙ্গে যুক্ত করা।

● কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং IoT-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৃষিতে এর ব্যবহার কীভাবে সম্ভব?

জাতীয় স্তরে তিনটি পর্যায়ে এর ব্যবহার হতে পারে। একটি হল ভারতীয় বিজ্ঞান আকাডেমির ধাঁচে একটি আলাদা আকাডেমি প্রতিষ্ঠা করা; যার শাখা থাকবে দেশের সর্বত্র। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি পঞ্চায়েতকে তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর মুখ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন ডাকা হয় সেখানে অ্যাজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত করে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করার জন্য রাজ্যগুলিকে বলতে হবে।

● ইদানীংকালের খাদ্য ফলন ব্যবস্থা, অরণ্য সংহার এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে উঠছে। সমস্যাটির সমাধান কীভাবে হতে পারে?

খাদ্য ফলন ব্যবস্থায় অধিক পরিমাণ জমির আবশ্যকতা অপরিহার্য। একটি দেশের আদর্শ ব্যবস্থায় কম পরিমাণ চাষের জমিতেই আরও বেশি ফলন পাওয়া উচিত। সচেষ্ট থাকা দরকার চাষ এলাকার সম্প্রসারণের পরিবর্তে উৎপাদনশীলতায় উচ্চতা অর্জনের লক্ষ্যপূরণে। আমাদের দেশে কৃষি জমিতে হেক্টরপিছু গড় ফলন ১ টন থেকে ১.৫ টন। অন্যদিকে, জাপানের মতো কয়েকটি দেশে ওই ফলন দাঁড়িয়েছে হেক্টরপিছু ৫ থেকে ৬ টনে। আরও বেশি ফলনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরাও কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জোর দিতে হবে বাসমতী-সহ বিভিন্ন প্রজাতির গুণমান বৃদ্ধির উপরও; কারণ রপ্তানি বাজারে এগুলির চাহিদা প্রচুর। বিশ্বের বৃহত্তম ধানচাষ এলাকা ভারতেই, যার পরিমাণ ৪ কোটি হেক্টরেরও বেশি। সুতরাং আরও বেশি ধান ও গম উৎপাদনের প্রভূত সম্ভাবনা আমাদের দেশে রয়েছে।

আমাদের দেশ যে কৃষিপ্রধান, এই সত্যকে মান্যতা দিতেই হবে। আধুনিক শিল্পে এখন যেখানে শ্রমসংকোচন সেখানে কৃষি-কাজ কিন্তু শ্রমনির্ভর। কর্মসংস্থানহীন আর্থিক বিকাশ কখনওই আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হতে পারে না। তাই জরুরি হয়ে উঠেছে শ্রমনির্ভর বিকাশের অপরিহার্যতা এবং এখানে কৃষিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সমাধানসূত্র।❑

অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথনের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

ভারতের কৃষি উজ্জীবনে অধ্যাপক এম. এস. স্বামীনাথনের অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তাকে সবুজ বিপ্লব আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক পুরোধা বলা হয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে তার নেতৃত্বাধীন চিরসবুজ বিপ্লব আন্দোলনকে সম্মান জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ প্রকল্পের (UNEP) পক্ষ থেকে তাকে 'অর্থনৈতিক বাস্তব্যবিদ্যার জনক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেগুলি হল : ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা (১৯৬১-'৭২), ভরতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের মহানির্দেশক, কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা ও কৃষি শিক্ষা দপ্তরের বিভাগীয় সচিব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের প্রধান সচিব (১৯৭৯-'৮০), যোজনা আয়োগের অস্থায়ী ডেপুটি চেয়ারম্যান ও পরে সদস্য (বিজ্ঞান ও কৃষি) (১৯৮০-'৮২) এবং ফিলিপিন্সস্থিত আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা সংস্থার মহানির্দেশক (১৯৮২-'৮৮)।

তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক স্বামীনাথনকে যেসব আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে সেগুলি হল : সমষ্টি উন্নয়নে নেতৃত্বদানের জন্য ১৯৭১ সালে রমণ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বিশ্ব বিজ্ঞান পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে প্রথম বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার, পরিবেশ সংক্রান্ত ভলভো, টাইলার ও রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ প্রকল্পে (UNEP) সাসাকাওয়া পুরস্কার, ২০০০ সালে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন পুরস্কার, ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট 'ফোর ফ্রিডমস' পদক, ২০০০ সালে ইউনেস্কোর মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার এবং ২০০৭ সালে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জাতীয় পুরস্কার। এছাড়া ১৯৬৭ সালে অধ্যাপক স্বামীনাথনকে পদ্মশ্রী, ১৯৭২ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৮৯ সালে পদ্মবিভূষণ দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সূত্র : *https://www.mssrf.org*

কায়াকল্প : জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রের রূপান্তর

প্রীতি সুদন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে কায়াকল্প প্রয়াসের সূত্রপাত ২০১৫ সালে। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য পরিসরে পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উন্নয়ন এই প্রয়াসের লক্ষ্য। এই উদ্যোগের ফলে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উৎসাহ ও দক্ষতা বেড়েছে; স্বাস্থ্যবিধানের প্রসার, পরিচ্ছন্নতা ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের কাজে গতি এসেছে।

জন পরিসর ও ব্যক্তিগত পরিসর, দুই ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য-বিধান মেনে চলার ওপর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় থেকেই এটি তাঁর সত্যাগ্রহ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। গান্ধীজীর কাছে স্বচ্ছতা অভিযান ছিল জাতপাতহীন মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরিচ্ছন্নতাকে তিনি ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলে মনে করতেন, তাই বলেছিলেন, ''প্রত্যেকের উচিত তার নিজের মলবাহক হওয়া।'' পরিচ্ছন্নতা অভিযানকে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূর করার চাবিকাঠি বলেও ভাবতেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকার সময়েই গান্ধীজী মলবহনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ভারতীয়রা যাতে নিজেদের শৌচাগার নিজেরাই পরিষ্কার করেন, তার জন্য বোঝাতেন। ভারতে ফিরে আসার পর স্বাস্থ্যবিধানের প্রতি তিনি আরও বেশি মনযোগ দিলেন। স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি বললেন, ''ভারতে আমাদের বিশেষ কাজ হবে মলবাহকদের কাজ নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়া।'' গান্ধীজী পরিস্রুত পানীয় জল ও দূষণমুক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সবাইকে বোঝালেন, বললেন কীভাবে খোলা জায়গায় শৌচকর্মের অভ্যাসের মোকাবিলা করা যায়। তিনি সব সময়ে বলতেন, ''স্বরাজের সূচনা হতে হবে বাড়ির সামনের রাস্তা থেকেই।''

গান্ধীজী বলেছিলেন, ''স্বাস্থ্যবিধান পালন স্বাধীনতার থেকেও বেশি জরুরি।'' আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকীতে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা করেন। লক্ষ্য ছিল মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী, অর্থাৎ ২০১১ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ করা। এজন্য দেশের গ্রামাঞ্চলে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯ কোটি শৌচাগার গড়ে তোলা হয়েছে। ৪ হাজার ৪১-টি বিধিবদ্ধ শহরেও এই অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের দু'টি ভাগ ছিল। একটি হল স্বচ্ছ ভারত অভিযান (শহর), যার দায়িত্বে ছিল কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। অন্যটি হল, স্বচ্ছ ভারত অভিযান (গ্রামীণ), যা ছিল কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের (অধুনালুপ্ত পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক) অধীনে। এই অভিযান ক্রমশ জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি নাগরিককে এই অভিযানে যোগ দিয়ে তাদের আশপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগী হতে বলেন।

২০১৯ সালের অক্টোবরে আমরা যখন একইসঙ্গে গান্ধীজীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করেছি, তখন স্বাস্থ্যবিধান নিয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ১২৫ কোটি ভারতবাসী

[লেখক ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secyhfw@nic.in]

একযোগে উদ্যোগী হলে তবেই গান্ধীজীর স্বপ্নের স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলা সম্ভব। এই অভিযান জাতির অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। অভিযানের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে শুধু যে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ হবে তাই নয়, এর জেরে চিকিৎসাজনিত খরচও কমবে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত, দেশজোড়া এমন এক অভিযান, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং যার লক্ষ্য হল দেশের প্রতিটি পরিবার, গ্রাম ও শহরে স্বচ্ছতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

জাতীয় এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বহু উদ্যোগের সূচনা করছে। ২০১৫ সাল থেকে নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও কল্যাণে স্বাস্থ্যবিধান পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কখনও নিজস্ব উদ্যোগে, কখনও অন্য মন্ত্রকের সঙ্গে অংশীদারিত্বে স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সার্বিক চেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

২০১৫ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'কায়াকল্প' উদ্যোগের সূচনা হয়। এর লক্ষ্য হল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতার প্রসার এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ। এর আওতায় নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকার সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রতি বছর প্রতিটি স্তরের শীর্ষ স্থানাধিকারিদের 'কায়াকল্প পুরস্কার' দেওয়া হয়। পুরস্কারে থাকে নগদ অর্থ ও প্রশস্তিপত্র। এই উদ্যোগের ফলে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উৎসাহ ও দক্ষতা বেড়েছে; স্বাস্থ্যবিধানের প্রসার, পরিচ্ছন্নতা ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের কাজে গতি এসেছে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় 'স্বচ্ছতা'-র মূল্যায়ন করা হয় সাতটি মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে। এজন্য মূল্যায়কদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই মাপকাঠিগুলি ছাড়াও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সঠিক পদ্ধতি ও নীতিনিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, সেদিকেও মূল্যায়করা দৃষ্টি রাখেন। এর ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নতুন গতি ও প্রাণের সঞ্চার করার পাশাপাশি কায়াকল্প এই ব্যবস্থার প্রতি মানুষের মনোভাবেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পেরেছে। রোগীদের প্রতিক্রিয়া জানানোর তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা 'মেরা আসপাতাল'-এ তারই প্রতিফলন চোখে পড়ে। সেখানে আগের তুলনায় 'সন্তুষ্ট' রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে।

কায়াকল্পের সূচনা হয়েছিল অনাড়ম্বরভাবে। প্রথম বছরে কেবলমাত্র জেলা হাসপাতালগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছিল। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে সব মহকুমা হাসপাতাল, গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে (গ্রাম ও শহর উভয়েরই) এর মূল্যায়নের আওতায় নিয়ে আসা হয়। কায়াকল্পে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। সূচনার সময়ে এর আওতায় ছিল ৭০০-টি জেলা হাসপাতাল। আর ২০১৮-'১৯ আর্থিক বছরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৬ হাজার। শুধু যে যোগদানকারীর সংখ্যা বেড়েছে তাই নয়, উত্তীর্ণের সংখ্যাও বেড়েছে বহুগুণ। এই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হতে হলে ন্যূনতম ৭০ শতাংশ পেতে হয়। প্রাথমিক ও পরবর্তী স্তর তো বটেই,সহায়ক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিও বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৫-'১৬ সালে যেখানে মাত্র ১০-টি প্রতিষ্ঠান যোগ দিয়েছিল, সেখানে ২০১৮-'১৯ সালে ২৪-টি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নিয়েছে। আরও একধাপ এগিয়ে এবার আয়ুষ্মান ভারত-স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কেন্দ্রগুলিকেও কায়াকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। রোগীদের মতামত ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে জেলা হাসপাতালগুলির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'মেরা আসপাতাল' অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কায়াকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চলতি বছরে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকেও কায়াকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। Quality Council of India—QCI তার অধীনস্ত National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers—NABH-এর মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও কায়াকল্পের মূল্যায়ন শুরু করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের কায়াকল্প নির্দেশিকা অনুযায়ী করা এই মূল্যায়নে যেসব মাপকাঠির ভিত্তিতে বিচার হচ্ছে সেগুলি হল : হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, সহায়ক পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতার প্রসার। দু'মাসের মধ্যে QCI দেশজুড়ে ৬৫৩-টি বেসরকারি হাসপাতালের মূল্যায়ন করেছে। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬৩৫-টি হাসপাতাল।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক গ্রামীণ এলাকায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় থাকা গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি সংক্রান্ত কমিটি এবং শহুরে এলাকায় জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় মহিলা আরোগ্য সমিতিগুলির সাহায্য নিচ্ছে। এগুলিকে আরও কার্যকর করে তুলতে বিভিন্ন রাজ্য বেশ কিছু উদ্ভাবনী পদক্ষেপও নিয়েছে। আশা কর্মীরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি সংক্রান্ত কমিটির সঙ্গে মিলে শৌচাগার নির্মাণ ও ব্যবহার করার পক্ষে জনমত গড়ে তুলছেন। শহুরে এলাকাগুলিতে সম্প্রতি ১০-১২ জন দরিদ্র অসহায় মহিলাকে নিয়ে এক-একটি মহিলা আরোগ্য সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে। তারা এলাকায় এলাকায় স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝাচ্ছেন।

স্বাস্থ্যবিধান ও পরিচ্ছন্নতার প্রসারে শুধু স্বাস্থ্য দপ্তর বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পেশাদারদের সঙ্গে নয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক আন্তঃমন্ত্রক সহযোগিতা নিয়েও ভেবেছে। কায়াকল্পের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং জল শক্তি মন্ত্রক একটি সংযুক্ত প্রকল্প শুরু করেছে, যার নাম ''স্বচ্ছ স্বাস্থ্য সর্বত্র''। এই প্রকল্পের আওতায় প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত অথচ

কায়াকল্পের মাপকাঠিতে এখনও উত্তীর্ণ নয়, এমন যেসব মহকুমা আছে, সেখানকার গোষ্ঠী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ২০১৯ সালে কায়াকল্পের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট ও কর্ণাটকের তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে পুরস্কৃত করেছে জল শক্তি মন্ত্রক।

কায়াকল্প ও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের এই প্রয়াসের স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা—WHO। তারা বলেছে, ভারতের প্রায় সব (৯৭ শতাংশ) জেলা হাসপাতালেই কোনও না কোনওভাবে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে। কায়াকল্প ও স্বচ্ছ ভারত, এই দু'টি কর্মসূচি, সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্য-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এবং সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ (পরিস্রুত জল ও স্বাস্থ্যবিধান) অর্জনেও সহায়ক হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতো স্বচ্ছ ভারত অভিযান দেশে ২০১৪ থেকে ২০১৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত ৩ লক্ষেরও বেশি মৃত্যু (ডায়েরিয়া ও প্রোটিনজনিত অপুষ্টি) এড়িয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের এই সাফল্য অভিনন্দনযোগ্য। ২০১৪-র অক্টোবরে এই অভিযান শুরুর সময় থেকে এযাবৎ দেশে ১ কোটি বাড়িতে শৌচাগার বানানো হয়েছে, প্রায় ৬ লক্ষ গ্রাম খোলা জায়গায় শৌচকর্মের বদভ্যাস ত্যাগ করেছে। বর্তমানে দেশের ৩৫-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষিত। কেন্দ্র ও সব রাজ্যের মিলিত এই প্রয়াস জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়া এনেছে। বলা হয় যে, স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলা এখন মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর জেরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক ফল তো মিলছেই (হাসপাতালে সংক্রমণ ছড়ানোর ঘটনা কমছে, অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমছে) মানুষ তাদের বাড়িঘর ও চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়েও সচেতন হচ্ছেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের এই গতি ও সাফল্য আরও প্রসারিত হবে এবং আমরা পৌঁছে যাব এক 'পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ভারত'-এ।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

শহরে সুষ্ঠু ও সুস্থায়ী সাফাই ব্যবস্থা

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

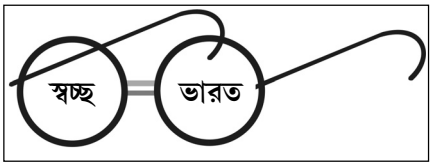

শহরাঞ্চলে স্যানিটেশনের জন্য গত পাঁচ বছরে ভারত সরকারের কর্মকৌশলের মূল বৈশিষ্ট্য হল টেকসই পরিকাঠামো, ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়ায় গুরুত্বদান। 'স্বচ্ছতা'-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সরকার সচেষ্ট। সহায়ক নীতি সমর্থন এবং সংস্কার, মিশন রূপায়ণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার, তৃতীয় পক্ষের যাচাই করা তথ্য-চালিত নজরদারি, পুর কর্মীদের সামর্থ্য গড়ে তোলা এবং স্যানিটেশন কর্মসূচির অর্জিত সাফল্য ও তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ মারফত তুখোড় এক পরিমণ্ডল গঠন করা চাই। এখন, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার তত্ত্ব বা ধ্যানধারণায় ক্ষমতায়ন এবং জীবনের মানের সত্তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শহরে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ইতোমধ্যে আমাদের জীবন এবং বৃহত্তর পরিবেশে সুফল আনা শুরু করে দিয়েছে। আমরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেলে "স্বচ্ছ, স্বাস্থ্য, সমর্থ্য এবং সশক্ত" নতুন ভারত গড়ে উঠবে।

২০১১-এর সেনসাস অনুসারে, শহরাঞ্চলে ১২.৬ শতাংশ পরিবার খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। পল্লি ভারতে মাঠেঘাটে ৬৮ শতাংশ লোকের শৌচ করার তুলনায় অনেক কম হলেও, এই অভ্যেস শহরের মানুষ এবং সার্বিক পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়া, দেশে মাত্র ৩৮ শতাংশ বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ৩৩ শতাংশের নিচে থাকায়, বাড়িঘরের থেকে কিংবা সাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরি শৌচালয়ের বর্জ্য নিষ্কাশন আদৌ নিরাপদজনক নয়। আরও এক বড়ো উদ্বেগের কারণ হল খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত জলের উৎসের ৭৫ শতাংশ দূষিত। এই দূষণের ৬০ শতাংশের জন্য দায়ি জলের উৎসে মেশা নর্দমার বর্জ্য।

রেখাচিত্র-১
শহরে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে উন্নতি

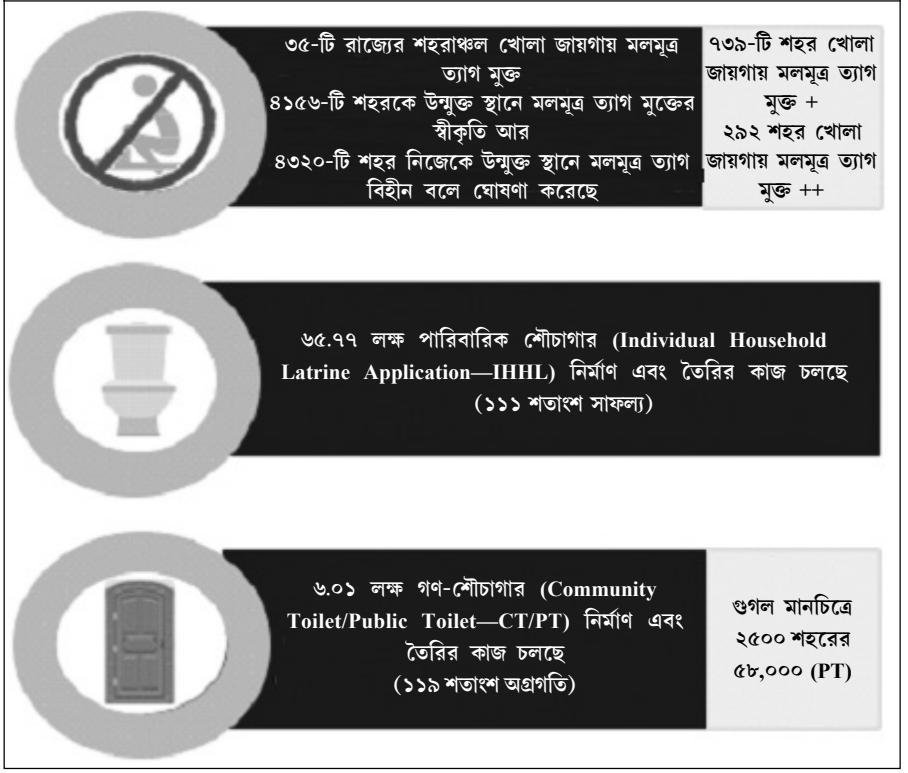

[লেখক আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secyurban@nic.in]

রেখাচিত্র-২
গুগল মানচিত্রে গণশৌচাগার (স্বচ্ছ ভারত মিশন—SBM টয়লেট)

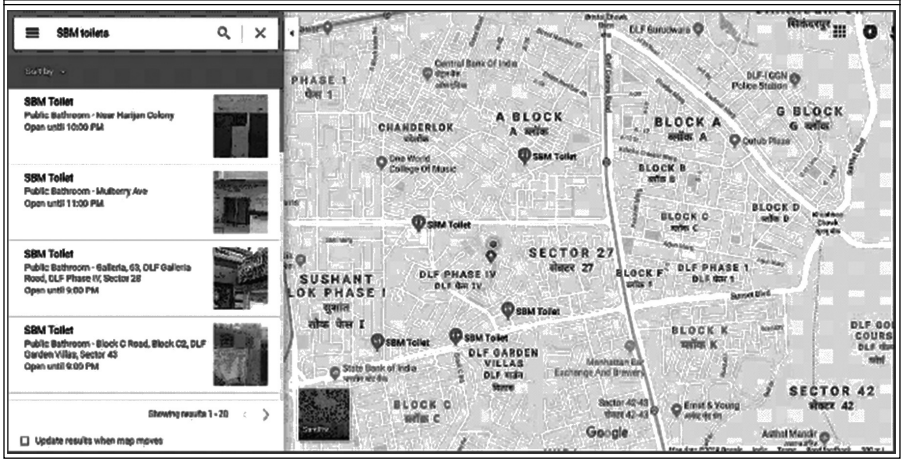

রেখাচিত্র-৩
খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ মুক্ত শহরের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

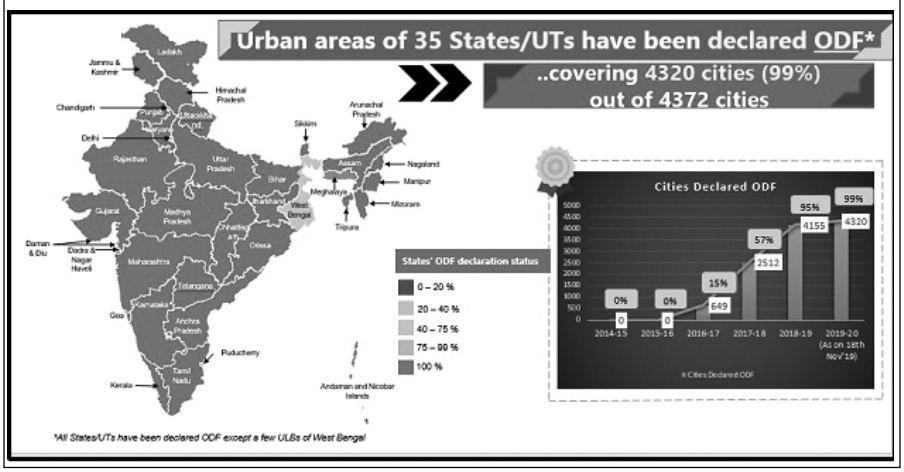

কুঞ্জিত স্যানিটেশনের মাশুল

সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য স্যানিটেশন, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির উপর ব্যাপক জোর দিয়েছে। আরও উন্নত মানের স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিচ্ছন্নতা ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গুর মতো রোগ, পরজীবী (Parasite) সংক্রমণ এবং পুষ্টির ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করে। গোটা বিশ্বেই এর অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে। ডায়রিয়ার মতো আন্ত্রিক রোগ, মানসিক বিষয়াদি এবং অ্যালার্জি সংক্রান্ত অসুখ কমানোর সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির যোগ নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনের (২০১১) হিসেব, উদরাময়ে (ডায়ারিয়া) মৃত প্রায় ৯০ শতাংশ শিশুর সঙ্গে দূষিত জল, স্যানিটেশনের অভাব অথবা অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধির সম্পর্ক আছে। সংক্রামক অসুখ কমা ছাড়াও, আরও উন্নত মানের স্যানিটেশনের সুবাদে কম ওজনের বাচ্চা জন্মানো, আপনা-আপনি গর্ভপাত এবং জন্মগত খুঁত হ্রাস পায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির উন্নতির দৌলতে শরীর স্বাস্থ্য আরও ভালো থাকে।

ভারতে পুষ্টি নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য প্রতিবেদন (পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া—PHFI, ২০১৫)[১] অনুসারে ২০০৬-'১৪-এ উত্তর-পূর্বের রাজ্য মিজোরামে খর্বকায় শিশুর জন্ম কমেছে ১৩ শতাংশ। আর কম ওজনের বাচ্চার জন্ম ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। উন্নত স্যানিটেশনের নাগাল পাওয়াতেই এই সিদ্ধিলাভ। উন্নত স্যানিটেশন শুধুমাত্র স্বাস্থ্যে অনুকূল প্রভাব ফেলেনি, সামাজিক এবং আর্থনীতিক উন্নয়নেও তার সুফল দেখা গেছে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। ভারতে ২০১৭ সালের আগস্টে ইউনিসেফ-এর এক সমীক্ষা[২] দেখিয়েছে যে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হলে পরিবারপিছু বাঁচবে বার্ষিক হাজার পঞ্চাশেক টাকা।

শহরে সুস্থায়ী স্যানিটেশনের লক্ষ্যে যাত্রা

২০১৯-এর ২ অক্টোবর শহর ভারত প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ মুক্ত হয়। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলিই বটে। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সাফল্য। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এযাবৎ কোনও সরকারি কর্মসূচিতে শহরে স্যানিটেশন ইস্যুটি এতখানি গুরুত্ব পায়নি। পাঁচ বছরে, মিশনের লক্ষ্যই শুধু পূরণ হয়নি, লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিশেষত মেয়েরা পেয়েছে সম্ভ্রম এবং নিরাপত্তা। ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মতো পতঙ্গবাহিত রোগের উৎপাত কমেছে অনেকটা। ফলে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন মাপকাঠিতে উন্নতির লক্ষণ স্পষ্ট। আখেরে শহর ভারত এগোচ্ছে সার্বিক পরিচ্ছন্নতার পথে। আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর), অম্রুত, স্মার্ট সিটি মিশন-এর মতো নানান কর্মসূচি চালাচ্ছে। এসব মিশন শহরাঞ্চলে স্যানিটেশনের সমস্যা মেটানোর চেষ্টায় সক্রিয়। গত পাঁচ বছরে শহরে স্যানিটেশনের বিভিন্ন উদ্যোগে যথেষ্ট সাফল্য মিলেছে (রেখাচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর)-এর আওতায় ৯৯ শতাংশের বেশি শহর এবং ৬৫-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রকাশ্যে মলত্যাগ মুক্ত হয়ে উঠেছে।

আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক শহরের সব গণ-শৌচালয়ের অবস্থান গুগলের মানচিত্রে দেখানোর জন্য সংস্থাটির সঙ্গে চুক্তি করেছে (রেখাচিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। লোকজন যাতে সহজে তাদের ধারেকাছের শৌচালয় খুঁজে পায় সেটাই এর উদ্দেশ্য।

বক্স-১
খোলা জায়গায় শৌচকর্মের রীতি মুক্তের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি

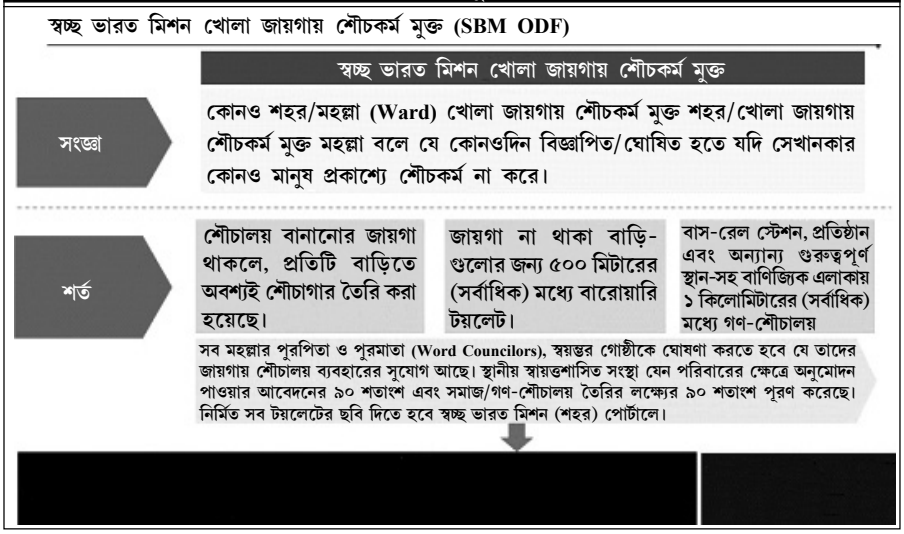

বক্স-২
প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত + (ODF +)-এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসকল

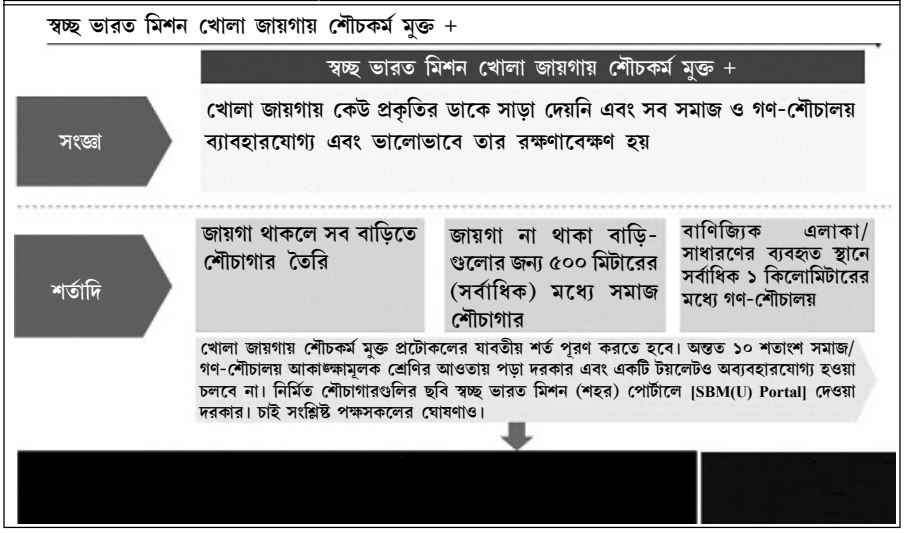

এযাবৎ, গুগল মানচিত্রে দেখা যায় ২৫০০-টি শহরের ৫৮,০০০ গণ-শৌচালয় (জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া—NHAI-এর ৫০০-টি শৌচাগার সমেত)।

রেখাচিত্র-৩ শহর ভারতের বছরভিত্তিক খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্তির অগ্রগতি তুলে ধরেছে।

শহর স্যানিটেশনের বন্দোবস্ত বাড়ানো ও তা সুস্থায়ী করার কর্মকৌশল

একেবারে গোড়া থেকেই আমাদের মনে এই প্রশ্নটা বড়ো হয়ে উঠেছিল যে শহরে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ মুক্তি কিভাবে বজায় রাখা সম্ভব। তাই এব্যাপারে আমরা নিয়মনীতি (protocol) চালু করেছিলাম। এধরনের উদ্যোগ দেশে এই প্রথম। এই প্রটোকল মাফিক এক নিরপক্ষে তৃতীয় পক্ষ শংসাপত্র দেবে কোনও শহর প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ মুক্তির ব্যাপারে সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে কিনা (বক্স-১ দ্রষ্টব্য)।

হাতে একবার শংসাপত্র জুটে গেলেই অনেক সময় ঢিলেমি আসে। খোলা জায়গায় শৌচকর্ম বন্ধের ক্ষেত্রে এটা এড়ানোর জন্য সার্টিফিকেটের বৈধতা বহাল থাকে মাত্র ৬-টি মাস। এরপর ফের শংসাপত্র জোগাড় করতে হবে।

তবে, আমরা বুঝেছিলাম যে, শুধুমাত্র প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ মুক্তির মারফত কোনও শহরে স্যানিটেশনের যাবতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যাবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, এক চিলতে জায়গা নিয়ে মাথাগোঁজা পরিবার, বস্তির বাসিন্দা, শহরে আগন্তুক লোকজন কিভাবে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবে? তারা কোথায় পাবে সাফ এবং ব্যবহারোপযোগী টয়লেট। শহরাঞ্চলে গণ-শৌচালয় তৈরি হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নোংরা সে শৌচাগারে ঢুকতে মানুষ দশবার ভাবত। সোজা কথায় যেসব টয়লেট ব্যবহার করতে গা ঘিনঘিন করত। বাধ্য হয়েই লোকে যত্রতত্র কাজ সারতো। তাই পরবর্তী যৌক্তিক ধাপ ছিল একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল, খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ মুক্ত + প্রটোকল ছকা যাতে শৌচাগারগুলি ব্যবহার করার পর পরিচ্ছন্ন থাকে এবং নাগরিকরা তা সত্যি সত্যি ব্যবহার করে। চালু হয় খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ মুক্ত + প্রটোকল, এক্ষেত্রেও তৃতীয় পক্ষের শংসা প্রয়োজন (বক্স-২ দ্রষ্টব্য)।

টয়লেট ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ কমলেও এসব শৌচালয় থেকে মলমিশ্রিত থকথকে ময়লা অপসারণের কী হল? পরিবেশে যাতে দূষণ না ঘটে সেজন্য এই নোংরা কিভাবে নিরাপদে সরানো হবে? ঘটনা হল, এই ময়লার অধিকাংশটা গিয়ে পড়ছিল মাঠেঘাটে, নদীনালায়। অর্থাৎ, খোলা জায়গায় মলত্যাগের চেয়ে তা আরও বেশি বিপদ ডেকে আনছিল। বস্তুত, হিসেব অনুযায়ী, শৌচাগারের মলমিশ্রিত এক লরি নোংরা ভাগাড়ে ফেলা আর ৩ হাজার লোক খোলা জায়গায় পায়খানা করা একই কথা। তাই, আমাদের পরের প্রচেষ্টা মলমিশ্রিত ময়লা সাফাই করার জন্য মলমূত্র ত্যাগ মুক্ত (ODF) ++ প্রটোকল। এজন্য, নির্দিষ্ট সময়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে ময়লা তোলা, দূষণ না ছড়িয়ে তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেই বর্জ্যের নিরাপদ প্রক্রিয়াকরণ। এক্ষেত্রে,

বক্স-৩

প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত ++ (ODF ++)-এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি

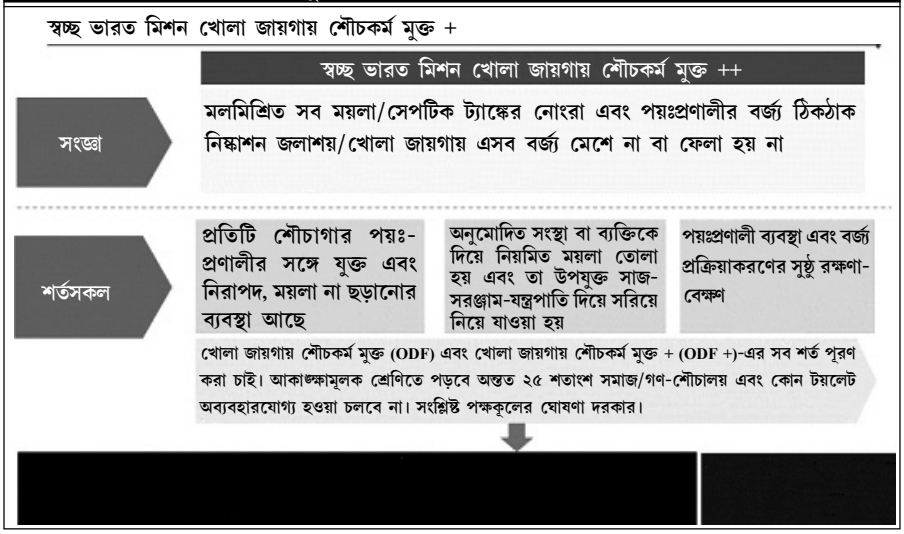

বক্স-৪

জল + এর জন্য আবশ্যক শর্তাদি

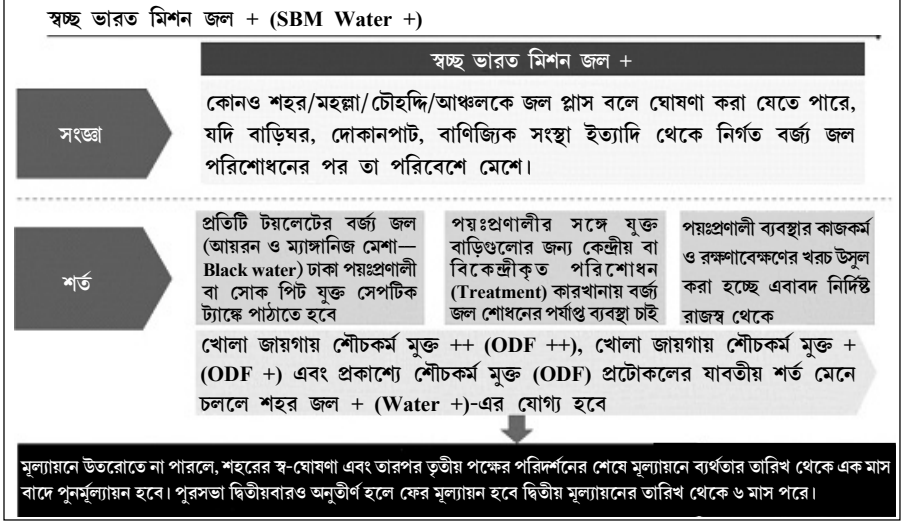

আমরা খরচ-সাশ্রয়ী এবং বিকেন্দ্রীত পথ নিতে শহরগুলিকে উৎসাহ দিয়েছি। পয়ঃপ্রণালী (Sewer) নেটওয়ার্ক-এর মতো প্রচুর মূলধন লাগে এমন দিকে ঝোঁকার পথ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে (বক্স-৩ দ্রষ্টব্য)।

শহর এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এসব প্রটোকলে ভালো সাড়া দিয়েছে এবং সুস্থায়ী স্যানিটেশনের লক্ষ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে বেশ সম্ভাবনা নিয়ে। আজ অবধি, ৭৩৯-টি শহর প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত + (ODF +) এবং ২৯২-টি শহর শৌচকর্ম মুক্ত ++ (ODF ++) বলে শংসিত। অম্বুত মিশনের আওতাতেও, মলমিশ্রিত থিকিথিকে ময়লা অপসারণে যথেষ্ট উন্নতি করা গেছে। পয়ঃপ্রণালী এবং সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা নিষ্কাশনে ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে ৬৩৭-টি প্রকল্প।

তবে, এখনও কিছু পথ পাড়ি দেওয়া বাকি বইকি। মলমিশ্রিত ময়লা সরানোর কাজ ইদানীং বেশ নিরাপদভাবে সারা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বর্জ্য জল (রান্নার ঘর এবং শৌচালয়ের অপেক্ষাকৃত কম দূষিত এবং আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজ মেশানো জল) বয়ে যায় খোলা নর্দমা দিয়ে এবং নদীনালা-সমুদ্র দূষিত হয়। দেশে জল সংকটের কথা মাথায় রাখলে, এটা আমাদের জলসম্পদের উপর এক বাড়তি বোঝা যা কিনা চলতে দেওয়া যায় না। এই চ্যালেঞ্জ সামলাতে, পরিবেশ এবং জলাশয়ে বর্জ্য জল ছাড়া বন্ধ করতে আমরা এখন চালু করেছি জল + (Water Plus) প্রটোকল (বক্স-৪ দ্রষ্টব্য)। চার নম্বর রেখাচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রটোকলের এক সংক্ষিপ্তসার।

পুর প্রতিষ্ঠানগুলির সীমিত সামর্থ্য এবং সুস্থায়ী স্যানিটেশনের হরেক চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখে, আমরা তাদের স্যানিটেশন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য সংস্থাগুলিকে ক্রমশ বেশি ক্ষমতাশালী করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলাম। যাতে দীর্ঘমেয়াদে টেঁকসই সমাধানের উপায় মেলে।

স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ : মিশনে নজরদারি ও প্রশাসনের জন্য এক হাতিয়ার

স্যানিটেশন এবং পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন মাপকাঠির নিরিখে শহরগুলির ক্রমপর্যায় বা র‍্যাঙ্ক ঠিক করতে, স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহর) এর আওতায় আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রকের এক উদ্ভাবনী সমীক্ষা হল স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ (রেখাচিত্র-৫ দ্রষ্টব্য)।

'স্বচ্ছতা' তত্ত্বের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় শহরগুলিকে উৎসাহিত করতে এই সমীক্ষা সফল হয়েছে। ২০১৬ সালে প্রথম দফায় রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির রাজধানী এবং ১০ লক্ষ ও তার বেশি জনসংখ্যার ৭৩-টি শহরে এই সমীক্ষা করা হয়। আর ২০১৭ সালে সমীক্ষাটির আওতায় ছিল ৪৩৪-টি শহর। ২০১৮-তে সমীক্ষা চলেছিল ৪,২০৩-টি শহরে। সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহরের তকমা জোটে ইন্দোরের কপালে। এই সমীক্ষাটি প্রথম সর্বভারতীয় স্যানিটেশন সমীক্ষা। এর আওতায় ছিল ৪০ কোটির মতো লোক। এধরনের সমীক্ষায় সম্ভবত এটি বিশ্বের বৃহত্তম। ২০১৯-এর স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ চলেছিল ৪,২৩৭-টি শহর জুড়ে। ইন্দোর ফের পরিচ্ছন্নতম শহরের শিরোপা পায়। ২০১৯-এর সমীক্ষাটি অনন্য, কেননা

রেখাচিত্র-৪
স্যানিটেশন প্রটোকল (Sanitation Protocols)

স্বচ্ছ ভারত মিশন খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত + (ODF +)	স্বচ্ছ ভারত মিশন খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত ++ (ODF ++)	স্বচ্ছ ভারত মিশন জল প্লাস (Water Plus)
সমাজ এবং গণ-শৌচালয়ের স্থায়িত্ব ও পরিচ্ছন্নতায় গুরুত্ব	জলমিশ্রিত হয় না এবং সেপটিক ট্যাঙ্কের বর্জ্য জলের নিরাপদ নিষ্কাশনের পাশাপাশি সমাজ এবং গণ-শৌচালয়ের স্থায়িত্ব ও পরিচ্ছন্নতায় নজর	পরিশোধন বর্জ্য যেন পরিবেশে না মেশে তা নিশ্চিত করতে দৃষ্টি
এপর্যন্ত ৭৩৯-টি শহর খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত + (ODF)-এর শংসাপত্র পেয়েছে	এযাবৎ খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত ++ (ODF ++)-এর শংসাপত্র পেয়েছে ২৯২-টি শহর	২০১৯-এর ১৩ আগস্ট চালু

রেখাচিত্র-৫
স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ মিশন নজরদারি এবং শাসনের হাতিয়ার

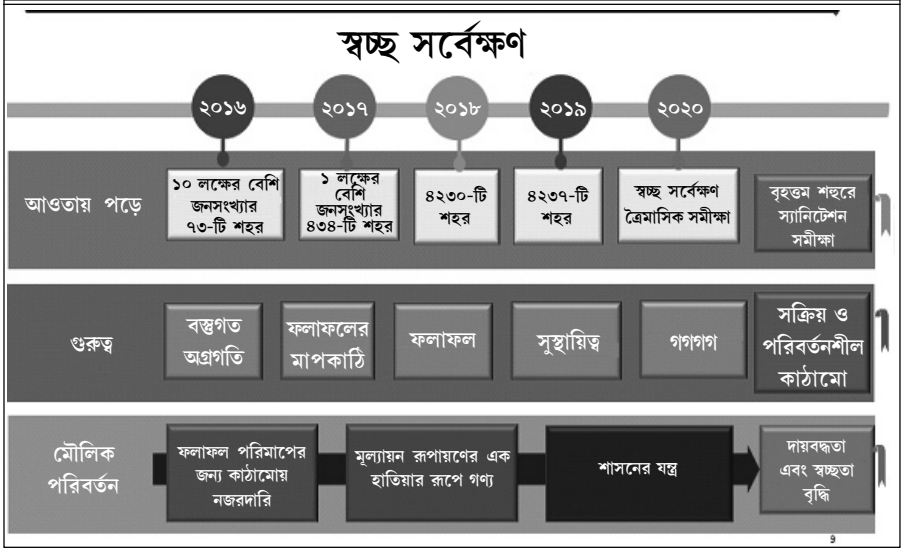

পরিষেবা পর্যায়ের মূল্যায়ন ছিল পুরোদস্তুর অনলাইন এবং কাগজপত্রবিহীন। বস্তুত, শহরে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে, সর্বেক্ষণের সুবাদে নিরাপদে মলমিশ্রিত ময়লা নিষ্কাশনের ইস্যুটি বেশ প্রেরণা পেয়েছে। খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত ++ (ODF ++) সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য শহর মাত্রেই খুব উৎসাহী।

অবিরাম নজরদারি এবং যাচাই ব্যবস্থা মারফত মিশনের সাফল্যের সুস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য, আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক ২০২০ সালের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের জন্য "ধারাবাহিক সর্বেক্ষণ"-এর তত্ত্ব চালু করেছে।

হাতে সাফাই বন্ধ করতে

হাত দিয়ে সাফাই কাজের রেওয়াজ পুরোপুরি তুলে দেওয়া সুনিশ্চিত করতে, সরকার বিভিন্ন আইনকানুন তৈরি করেছে। সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং মাটির নিচে নর্দমায় (underground drain) ঢুকতে খুব বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমতি মেলে এবং সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম থাকা চাই। যথাযথ পরিকাঠামোর অভাব এবং সেইসঙ্গে আইন বলবৎ করায় খামতি, এ দুইয়ের যুগলবন্দির দরুন যুতসই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই হাত দিয়ে সাফাইয়ের চলন এখনও দিব্যি বহাল। ফলে ঘটছে কত না মারাত্মক দুর্ঘটনা। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পয়ঃপ্রণালী এবং সেপটিক ট্যাঙ্কের নোংরা নিকাশের কাজ পুরোপুরি বন্ধ করতে, আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও সেপটিক ট্যাঙ্কে না ঢুকে সাফাই করা অসম্ভব এমন সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থাকার ব্যাপারেও মন্ত্রক সক্রিয়। মাটির নিচে পয়ঃপ্রণালী ও সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করার সময় সাফাই কর্মীদের মারাত্মক দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর ঘটনা আমাদের সমাজের বিবেককে এখনও পীড়িত করে চলেছে। আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক তাই সুস্থায়ী স্যানিটেশনের লক্ষ্যে তার কর্মপ্রচেষ্টা আরও জোরদার করে তোলার জন্য বড়ো বড়ো শহরে জরুরি মোকাবিলা স্যানিটারি ইউনিট (Emergency Response Sanitation Unit—ERSU) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। হাত দিয়ে ময়লা সাফাই এবং পরিষ্কার করার ঝুঁকিবহুল কাজকর্ম রুখে দিয়ে নিরাপত্তার রীতিনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার এ এক উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি। মন্ত্রক চায়, মাটির নিচেকার পয়ঃপ্রণালী এবং সেপটিক ট্যাঙ্কে সাফাই কর্মীদের ঢোকাটা সুপ্রশিক্ষণ, প্রেরণা এবং উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে পেশাদারি মনোভাবে পরিচালিত করা।

● **অন্যান্য প্রধান উপায় : প্রযুক্তি কাজে লাগানো, আচারে জোর পরিবর্তন এবং পুরসভার ক্ষমতা**

এছাড়া, শহরাঞ্চলের স্যানিটেশন আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগ বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে জোরদার হয়েছে, যেমন :

☐ নাগরিকদের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে যাওয়ার জন্য প্রযুক্তি এবং 'স্মার্ট' সলিউশান কাজে লাগানো (যেমন, গুগল মানচিত্রে গণ-শৌচালয়, স্যানিটেশনের যাবতীয় ব্যাপারে নাগরিক অসন্তোষ মেটাতে স্বচ্ছতা অ্যাপ)।

☐ রিয়্যাল টাইম ডেটা জোগাড়ের জন্য জোরালো অনলাইন এমআইএস (MIS) এবং পোর্টাল।

রেখাচিত্র-৬
স্যানিটেশনে এগোনোর উপায়

স্বচ্ছতায় সম্পন্নতা (সোয়াচ্ছতা সে সম্পন্নতা)		
সুস্থায়ী স্যানিটেশন	সম্পূর্ণ মলমিশ্রিত ময়লা ব্যবস্থাপনা	✶ মল মেশানো সব থিকথিকে ময়লা নিরাপদে নিষ্কাশন (সকল শহরকে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত ++ (ODF ++) রূপে গড়ে তোলা ✶ ময়লা ফেলার পর্যাপ্ত গাড়ি
	মাটির তলাকার পয়ঃপ্রণালী এবং সেপটিক ট্যাঙ্কে সাফাই কর্মীদের বিপজ্জনকভাবে ঢোকা বন্ধ করা	✶ নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, পয়ঃপ্রণালী/ সেপটিক ট্যাঙ্কের যান্ত্রিক সাফাই ✶ বড়ো বড়ো সব শহরে জরুরি মোকাবিলার স্যানিটেশন ইউনিট (Emergency Response Sanitary Units—ERSU) এবং দায়বদ্ধ স্যানিটেশন কর্তৃপক্ষ (Responsible Sanitation Authority) গঠন
বর্জ্য জল প্রক্রিয়াকরণ, অর্থাৎ শোধন	শহরে বর্জ্য জল শোধন এবং পুনর্ব্যবহার	জলাশয়ে ফেলার আগে বর্জ্য জল শোধন এবং সেই শোধিত জল যত বেশি সম্ভব ফের ব্যবহার করা

☐ নাগরিকদের সঙ্গে বেশি করে যোগাযোগের জন্য স্বচ্ছতা মঞ্চ।

☐ আচরণগত পরিবর্তনের উদ্যোগ [(নামকরা ব্যক্তিকে দূত (Ambassador) হিসেবে নিয়োগ, গণমাধ্যমে দৃশ্য/শ্রাব্য প্রচার অভিযান, স্বচ্ছতা নিজস্বী (Swachhata Selfie)] ইত্যাদি।

☐ কারিগরি পরামর্শ, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে পুরসভাগুলির অবিরাম সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এগোনোর পথ

শহর ভারত এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের মুখে। ছোটোবড়ো শহরে স্যানিটেশনের অবশ্যই উন্নতি হয়েছে, তা সত্ত্বেও এখনও অনেক কাজ বাকি। প্রতিটি শহরকে সত্যিকার স্মার্ট এবং বাসোপযোগী করে তুলতে হলে এই অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে হাত লাগাতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যথেষ্ট সংখ্যক শৌচালয় (ব্যক্তিগত ঘরবাড়িতে এবং সমাজ/গণ-শৌচাগার উভয়ই) বানানো হয়েছে এবং খোলা জায়গায় শৌচকর্মের রীতি ছেড়ে দিয়ে মানুষ তা ব্যবহার করতেও শুরু করে দিয়েছে। তবে কিনা সমাজ/গণ-শৌচালয় দেখভাল আরও জোরদার করা দরকার। দেখতে হবে টয়লেট যেন অব্যবহার্য না হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, সার্বিক স্যানিটেশন মারফত স্বাস্থ্যোন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে ঘরবাড়ির আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত জল এবং তুলনামূলক পরিষ্কার জল এবং শৌচালয়ের মলমিশ্রিত নোংরা এবং বর্জ্য জল নিরাপদে সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্তে আরও জোরদার করা চাই। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা না থাকা ছোটোখাটো শহরগুলির বেলায় একথা বেশি খাটে। এটা সত্যি দেশের ৬০ শতাংশ পরিবারের জন্য। এসব বাড়ির পায়খানায় সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরি হলেও, অনেক ক্ষেত্রে সোক পিট না থাকাটাই রেওয়াজ। সেপটিক ট্যাঙ্কের নোংরা লরি করে বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয় খোলা মাঠেঘাটে। এর মানে, প্রকাশ্যে শৌচকর্ম মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সার্বিক স্যানিটেশনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এবং অন্যান্য উপকারের লক্ষ্যে পৌঁছনো অধরা থেকে যাবে।

আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক শহরগুলিতে সব সমাজ এবং গণ-শৌচালয় গুগলের মানচিত্রে তুলে ধরার ব্যবস্থা করেছে। নাগরিক এবং আগন্তুকরা যাতে তাদের ধারেকাছের শৌচালয় সহজে খুঁজে পায়। এযাবৎ, গুগলের মানচিত্রে ঠাঁই পেয়েছে ২৫০০-টি শহরের ৫৮,০০০ গণ-শৌচাগার (এর মধ্যে ৫০০-টি জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের National Highway Authority of India : NHAI)।

শহরে স্যানিটেশনের উন্নতি এখনও পাকাপোক্ত নয়, পলকা এবং দীর্ঘমেয়াদে এই সাফল্য ধরে রাখতে না পারলে পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সেইসঙ্গে 'স্বচ্ছতা'-র উপর জোর বাড়ায় জনতার আশঙ্কা গেছে বেড়ে : নাগরিকরা এখন আরও বেশি উন্নতমানের পরিষেবা দাবি করছে এবং চাইছে 'স্বচ্ছতা'-র আরও উন্নত স্তর। তাই 'স্বচ্ছতা'-র ধারণাকে ঘিরে তৈরি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার।

আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রকের বিভিন্ন মিশন বা অভিযান শহরাঞ্চলে উন্নয়নের টেঁকসই মডেল দেখিয়েছে। সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকারের সঙ্গে মিলমিশ রেখে নিরাপদ স্যানিটেশনের সার্বিক ফল লাভের জন্য আরও এগিয়ে গিয়ে স্বচ্ছতার ধারণাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য নজর দিতে হবে।

এই পটভূমি, শহরে স্যানিটেশনের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে স্যানিটেশনে অর্জিত সাফল্য বজায় রাখা এবং তা আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শহর ভারতকে ''স্বচ্ছতা''-র পরবর্তী ধাপে পৌঁছে দেওয়া। সুফল আরও পাকাপোক্ত করতে স্যানিটেশন সংক্রান্ত পরিবেশ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। তাই আগামী দিনগুলিতে আমাদের নিচের ক্ষেত্রগুলিতে নজর দেওয়া দরকার :

☐ সুস্থায়ী স্যানিটেশন (সব শহরকে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম মুক্ত ++ : ODF++ সেইসঙ্গে মলমিশ্রিত থিকথিকে নোংরা এবং সেপটিক ট্যাঙ্কের ময়লা ব্যবস্থাপনা (Faecal Sludge and Septage Management—FSSM)।

☐ বর্জ্য জল পরিশোধন (আবাসন ও শহর বিষয় মন্ত্রকের জল + প্রটোকল—Water Protocol মাফিক)।

'স্বচ্ছতায় সম্পন্নতা' নীতির আওতায় এসবের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করা দরকার।

এছাড়া, সহায়ক নীতি এবং সংস্কার মারফত এক সক্ষম পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এই পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে মিশন রূপায়ণে প্রযুক্তি কাজে লাগানোর পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষ দিয়ে যাচাই করে নজরদারি,

পুরকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ করা চাই। বাধাধরা গতের খোলস ঝেড়ে ফেলে, ফলাফলের ভিত্তিতে তহবিল জুগিয়ে শহরগুলিকে উৎসাহ দেওয়া, মিশনের প্রশাসনকে ডিজিটালি আরও সক্ষম করা এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত পথ মাফিক কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যাবতীয় সমস্যা ঘোচাতে একটি জাতীয় উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

পরিশেষ

এখন, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার তত্ত্ব বা ধ্যানধারণায় ক্ষমতায়ন এবং জীবনের মানের সত্তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শহরে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ইতোমধ্যে আমাদের জীবন এবং বৃহত্তর পরিবেশে সুফল আনা শুরু করে দিয়েছে। আমরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেলে ''স্বচ্ছ, স্বাস্থ্য, সমর্থ্য এবং সশক্ত'' নতুন ভারত গড়ে উঠবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) PHFI. (2015). India Health Report-Nutrition 2015. PHFI. Accessed from http://www.transformnutrition.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/INDIA-HEALTH-REPORT-NUTRITION_2015_for-Web.pdf

(২) https://mdws.gov.in/sites/default/files/ UNICEF_Economic_impact_study.pdf

দেশের কৃষকদের জন্য আলাদা একটি চ্যানেল ''ডিডি কিষাণ''। এই চ্যানেলটি প্রত্যেক দিন ২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ। এর মূল বিষয়বস্তু কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র। এই চ্যানেলের মাধ্যমে অহরহ কৃষকদের চাষ-আবাদের নিত্যনতুন পদ্ধতি, জল সংরক্ষণ ও জৈব চাষের মতো বিষয়সমূহ নিয়ে অবগত করা হয়। এই চ্যানেলের উদ্দিষ্ট দর্শকবৃন্দ গো-পালক, মৌমাছি পালক, পোল্ট্রি মালিক, মিস্ত্রি ও কারিগর। আগেভাগেই জানানো হয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং তার সঙ্গেই সাযুজ্য রেখেই কীভাবে খরচ কমিয়ে ফসল বাঁচানো যায় বা ফলন বাড়ানো যায়। নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শও সম্প্রসারিত করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে কৃষি ক্ষেত্রের নতুন নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং গবেষণা ও বিকাশের তথ্যাদি ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরে এই চ্যানেল।

সূত্র : https://doordarshan.gov.in/ddkisan

জল ব্যবস্থাপনা : এক মজবুত দেশ গঠনের প্রথম শর্ত

ইউনিসেফ WASH গোষ্ঠী

এই দেশকে ওপেন ডিফেকেশন ফ্রি (ODF) বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে খোলা জায়গায় শৌচকার্য বন্ধ হয়েছে। এখন এই শরীর নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে পানীয় জলের মান খারাপ হবে। এখন সরকারকে সর্বস্তরে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাজ করতে হবে, যারা এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। একমাত্র তাহলেই সহায়সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার সম্ভব।

এই পৃথিবীতে এক এক প্রাণীর জীবনযাত্রার ধরন আলাদা। কিন্তু একটা বিষয়ে তারা সবাই এক সূত্রে বাঁধা। এই পৃথিবীর জল, হাওয়া, মাটি ছাড়া তাদের কারও পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই আমাদের সবার কাজকর্ম পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে পড়েছে। আমাদেরই বিভিন্ন কাজকর্মের ফলে আবহাওয়ার চিরাচরিত ধরন বদলে যাচ্ছে। এর ফলে মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। ২০১৭ সালে UKAID-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে গত দশ বছরে জলবায়ুজনিত কারণে প্রতি বছর ১৭০ বিলিয়ন বা ১৭,০০০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই দেশের কিছু কিছু এলাকায় বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে গেছে। ফলে অঞ্চলগুলি খরাপ্রবণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা হয় খরাপ্রবণ, নয়তো তা মরু অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।[১] এতে চাষের ওপর নির্ভরশীল মানুষের বিপদ বেড়েছে। স্থানীয় জলের উৎসগুলির ওপর ক্রমাগত চাপ পড়ায় জলের স্তর ক্রমশই নিচে নেমে যাচ্ছে। উৎসগুলি থেকে অত্যধিক নিষ্কাশনের ফলে জল দূষিত হচ্ছে। তার ওপর পরিবেশের মান বজায় রেখে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর না আছে জ্ঞান, না আছে উপযুক্ত পরিকাঠামো।

জল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অন্যতম সহযোগী ইউনিসেফ। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য (সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা SDG)[৬]-পূরণ অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারকে সাহায্য করবে ইউনিসেফ। জলের উৎসগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে সরকার তথা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে ইউনিসেফ।

[লেখকগোষ্ঠী : ইউসুফ কবির, Water, Sanitation and Hygience (WASH) বিশেষজ্ঞ তথা DRR Focal Point with UNICEF, India; প্রেমা গোপালন, Executive Director, স্বয়ম শিক্ষণ প্রয়োগ, পুণে; ওঙ্কার খারে, State DRR Consultant, UNICEF মুম্বাই; নাসিম শেখ, প্রকল্প অধিকর্তা, স্বয়ম শিক্ষণ প্রয়োগ, পুণে; উপমন্যু পাটিল, Red R India; কৃতিকা কার্কি ও অ্যান্ড্রু উইলিয়ামসন, UNV, DRR Section, UNICEF দিল্লি। নানক সন্তদাসানী, WASH বিশেষজ্ঞ, UNICEF, জয়পুর; অনিরুদ্ধ খান্না, তরুণ পেশাদার, Tata Institute of Social Sciences; বীরজা কবি শতপথী, WASH বিশেষজ্ঞ, UNICEF, ছত্তিশগড়। যোগাযোগর ই-মেল : smanchikanti@unicef.org]

পরিবেশ ও মানুষ : মহারাষ্ট্রের জল সংকট রয়েছে এমন এলাকাগুলিতে স্থানীয় মহিলাদের কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে

গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছরই মহারাষ্ট্রে খরা ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের মোট ভৌগোলিক এলাকায় প্রায় ৭০ শতাংশই আধা-শুষ্ক অঞ্চলে অবস্থিত। এই এলাকাগুলিতে এমনিতে তো জলসংকট রয়েছেই, তার ওপর বছর বছর লাগাতার খরায় এই সংকট আরও তীব্র হচ্ছে[২]। এর ফলে ভীষণভাবেই প্রভাবিত হচ্ছে কৃষিকাজ। কোনও বছর ফলন ভালো হচ্ছে, আবার কোনও বছর তা পুরো মার খাচ্ছে। এতে মানুষের আয়ের তারতম্য হচ্ছে। এইসব অঞ্চলে দারিদ্র্যের হারও তাই অপেক্ষাকৃত বেশি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ফলন কমার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মানুষও ক্রমে দারিদ্র্যের জালে জড়িয়ে পড়ছেন।

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের সহায়তায় ইউনিসেফ মহারাষ্ট্র ২০১৫-’১৬ সালে এক সমীক্ষা চালিয়েছিল। রাজ্যের মারাঠওয়াড়া অঞ্চলের স্থানীয় মানুষজন, বিশেষত মহিলা ও শিশুদের ওপর সাম্প্রতিক খরা ও খরার মতো পরিস্থিতির কী প্রভাব পড়ছে এবং তার মোকাবিলায় কী ব্যবস্থাই বা নেওয়া হচ্ছে মূলত তারই ওপর এই সমীক্ষা। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায় অর্ধেক গ্রামে মানুষের পানের জন্য তথা গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের জন্য জলের একটিমাত্র উৎস রয়েছে। কৃষকদের ২৭ শতাংশই জল ব্যবস্থাপনার কোনও পদ্ধতি জানে না। বছরের যে সময় বৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ শুষ্ক মরসুমে ৮৪ শতাংশ পরিবারের কাছেই সেচের কোনও উপায় থাকে না। জল সংকটের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন মহিলারা। তাদের ওপর কাজের বোঝা তিন গুণ বেড়ে যায়। দূরদূরান্ত থেকে তাদের পানীয় জল, জ্বালানি, পশুখাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। তার ওপর ঠিকা কাজ খুঁজতে হয়। এর ফলে তারা উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুযোগ

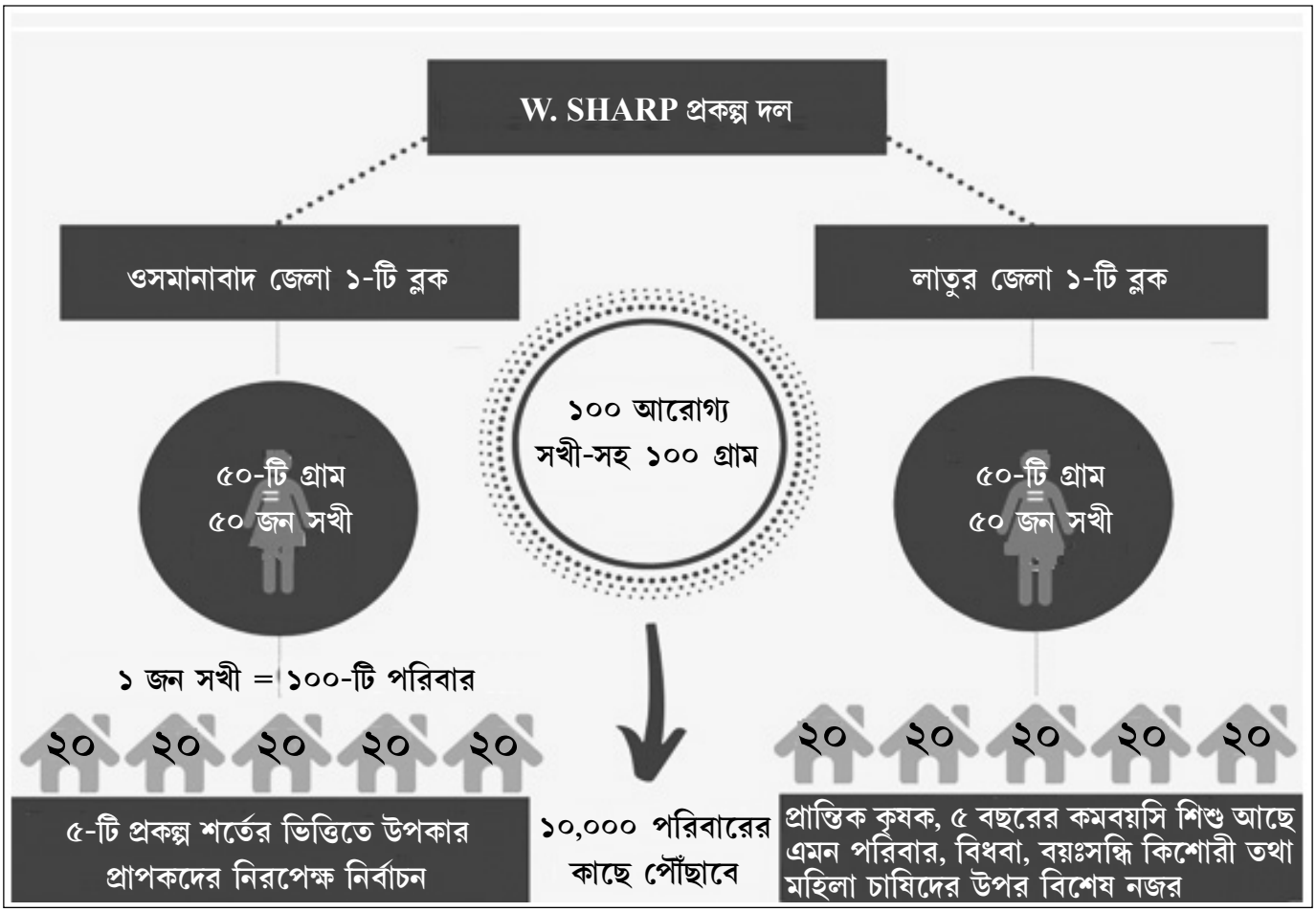

পান না। এতে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তারা অপুষ্টিতে ভোগেন। পরবর্তী প্রজন্মগুলির ওপরও এর প্রভাব রয়ে যায়।

শোষণের অবসান ঘটানো ও বেহাল প্রশাসনিক ব্যবস্থার মোকাবিলায় যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নেই বলে তা অসম্পূর্ণ রয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসমষ্টিকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন রূপায়ণকারী সংস্থা-সহ ইউনিসেফ মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প রূপায়ণের কাজ হাতে নিয়েছিল।

জল, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প (উইমেন লেড ওয়াটার, স্যানিটেশন, হাইজিন অ্যান্ড রেসিলিয়েন্ট প্র্যাক্টিসেস প্রজেক্ট বা W-SHARP : মারাঠওয়াড়ার মতো বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে শুষ্ক মরসুমে, অর্থাৎ মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে জলের জোগান সবচেয়ে কম থাকে সেইসব অঞ্চলে স্থানীয় অবস্থা ও ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে গৃহীত পরিকল্পনার কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য ২০১৮ সালে এই W-SHARP-টি হাতে নেওয়া হয়।

মহারাষ্ট্রের দু'টি খরাপ্রবণ ব্লকের ১০০-টি গ্রামের ১০ হাজার পরিবারের কাছে জলের জোগান তথা জীবিকার সুযোগ বাড়ানো তথা তাদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই প্রকল্পের অবতারণা। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি প্রসারের জন্য মহিলা ও বিপন্ন পরিবারগুলিকে শামিল করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল W-SHARP-এর আওতায়। বলা ভালো, মহিলা বা এই পরিবারগুলির অংশগ্রহণই ছিল এই প্রকল্পের মূল বিষয়। একটি অভিন্ন লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সংস্থা তথা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে একজোট করতে মহিলাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চেঞ্জ এজেন্ট বা পরিবর্তনের দিশারি হিসাবে এক অভিনব উপায়ে তাদের শামিল করা হয়েছে। এর ফলে অনিশ্চিত বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার নানা পদ্ধতি শিখে নিতে প্রান্তিক মহিলাদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা গেছে।

W-SHARP কীভাবে কাজ করেছে?

স্থানীয় প্রশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও বর্তমানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিপন্নতার নিরিখে দু'টি ব্লকের প্রতিটি থেকে ৫০-টি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে প্রতিটি গ্রাম থেকে সবচেয়ে বিপন্ন ১০০-টি পরিবারকে শামিল করা হয়েছে। এই পরিবারগুলি হয় কোনও প্রান্তিক কৃষকের নয় তো এই পরিবারগুলির মাথায় রয়েছে কোনও মহিলা বা ভূমিহীন শ্রমিক। যেসব পরিবারে বয়ঃসন্ধির কিশোরী বা পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশু রয়েছে সেই পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; যাতে জীবিকা বা পুষ্টির সুফল পরিবারের কর্তার কাছ থেকে শিশুদের কাছে পৌঁছোতে পারে। মোট ১০ হাজার পরিবারকে শামিল করা হয়েছে এই প্রকল্পে।

এই প্রকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপন্নতা ও নারী ক্ষমতায়নের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্য, জল নিরাপত্তা এবং প্রতিকূল জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী কৃষি পদ্ধতির প্রসারের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেত্রী ও 'আরোগ্য সখী'-দের (স্বাস্থ্যবন্ধু) বেছে নেওয়া হয়েছে এবং ইউনিসেফ ও সংশ্লিষ্ট রূপায়ণকারী সংস্থা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রতিটি গ্রামেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতাদের নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে সচেতনতা প্রসার ও জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই টাস্ক ফোর্সগুলিকে। এই কাসকেড ট্রেনিং মডেলে (যেখানে একজনের কাছ থেকে জ্ঞান সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ে) ১০০ জন সখী প্রকল্পের শেষ অবধি আরও অনেক মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং জল ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টিকর ফসলের চাষের জন্য বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তথা গ্রাম স্তরের নেতাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন পাঁচশোরও বেশি মহিলা।

এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল স্থানীয় স্তরের প্রশাসনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও নাগরিক সংগঠনগুলির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় ও একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের একটা মঞ্চ গড়ে দিয়ে চেয়েছে W-SHARP। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে একটি ৭ স্টার টুল বা প্রকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণের ওপর নজরদারি চালিয়ে তথা 'আশা' ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর মতো পরিষেবা প্রদানকারীদের কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে জনগোষ্ঠীর সব সদস্যের আচরণের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করা যায় এবং প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে একদিকে মানুষের মধ্যে সচেতনতা যেমন বেড়েছে তেমনই জল সংরক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদি জল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলির রূপায়ণ সহজ হয়েছে।

মূল যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে

পরিবারগুলিকে শামিল করা : পারিবারিক স্তরে উন্নত জল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা ও সেগুলির প্রয়োগের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য আরোগ্য সখীরা তাদের নিজেদের গ্রামের মহিলাদের গোষ্ঠীগুলিকে শামিল করেছেন। এই আলাপ-আলোচনার

জল বাজেটিং : একটি পরিবারের জনসংখ্যা কত, সেই পরিবারে মূলত কোন কোন কাজে জলের ব্যবহার হয় তা বুঝে জলের পুনর্ব্যবহারের জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করাই হল জল বাজেটিং। নিজেদের সহায়সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহারে পরিবারগুলিকে শামিল করার ক্ষেত্রে এটি একটি সহজ অথচ কার্যকরী পন্থা।

মাধ্যমে মহিলারা বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার, জল বাজেটিং, সোক-পিট ও জল সংরক্ষণ-মূলক অন্যান্য ব্যবস্থার কথা জানতে পেরেছেন।

এই প্রকল্পের আওতায় থাকা প্রতিটি পরিবারই জল বাজেটিং-এর পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেছে।

● জনসাধারণের ব্যবহার্য সমস্ত জলের উৎসকে **স্যানিটেশন নজরদারি পরিকল্পনার** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

● গ্রে ওয়াটার বা গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত যে জল ফেলে দেওয়া হয় (এখানে শৌচাগারের জল থাকছে না) তা পুনর্ব্যবহারের জন্য **১,৩৯২-টি সোক পিট তৈরি করা হয়েছে।**

● এই দু'টি ব্লকের বিদ্যালয়গুলিতে ২৮-টি **গ্রুপ হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে।**

জনগোষ্ঠীকে শামিল করা : প্রতিকূল জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ও জীবিকার অন্যান্য বিকল্পগুলি আলাপ-আলোচনায় জনগোষ্ঠীগুলিকে শামিল করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন, আরও বেশি করে জৈব সার ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্যরক্ষা ও তার উন্নতিসাধন, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলের সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

● জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী কৃষি পদ্ধতির বিষয়ে জনগোষ্ঠীর নেতা ও দু'-হাজার মহিলা কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

● ১৭৩৫ জন মহিলা কৃষক বর্তমানে মিলিয়ে মিশিয়ে একাধিক ফসলের চাষ করছেন।

● কেঁচো সার বা ভার্মিকমপোস্ট তৈরির ১২৪-টি কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

● যে পশুখাদ্য উৎপাদনে কম জল লাগে সেগুলির ব্যবহার ও গৃহপালিত পশুপাখির জন্য আলাদাভাবে জল বরাদ্দ রাখার ওপর জোর দিয়েছে ২,৬৫০-টি পরিবার।

জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ : একটি গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায় ৮০-টি পরিবারের কাছে গিয়ে গ্রামে একটি গভীর কুয়ো (বোর ওয়েল) তৈরির জন্য ২,০০০ টাকা সংগ্রহ করেছেন। লিটারপিছু জলের জন্য একটা নামমাত্র মূল্য নিয়ে প্রতিটি পরিবারের জন্য চার কন্টেনার করে জল বরাদ্দ করা হয়েছে। গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজের জল থেকে পানীয় জলকে আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিকটবর্তী ভূতলের বিভিন্ন জলাশয় থেকে গৃহস্থালির কাজের জল সংগ্রহের জন্য পরিবারগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। জল সঞ্চয় ও ভূগর্ভস্থ জল স্তর পূরণের জন্য তিনশো জন মহিলা ১২০,০০০ বর্গমিটার পরিখা খুঁড়েছেন যা গ্রামের জনবসতির সঙ্গে কৃষিজমিকে যুক্ত করেছে।

● পুষ্টিকর খাবার-দাবারের জন্য নিজেদের বাড়ির বাগানেই শাকসবজির চাষ শুরু করেছে ১,৪৭০-টি পরিবার।

প্রশাসনের বিভিন্ন উদ্যোগকে মিশিয়ে দেওয়া : স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করতে জাতীয় ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলিকে এই প্রকল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেটা এই প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ধরনের কর্মসূচিগুলির তহবিল এই প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ (SBM-G), মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন এবং ATMA (কৃষি প্রযুক্তি ও পরিচালন সংস্থা) ইতাদি তহবিল থেকে মোট ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এই প্রকল্পের জন্য পাওয়া গেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী একশোটি গ্রাম মানে দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের পথে একশো পদক্ষেপ

স্বচ্ছ ভারত মিশন ও জল শক্তি অভিযান-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই W-SHARP-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। উপরোক্ত দু'টি কর্মসূচিতেই জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃতির সহায়সম্পদ রক্ষা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য অংশেও এই প্রকল্পের মডেল প্রয়োগ করা যায় কিনা, তার মূল্যায়ন করতে প্রকল্পের অগ্রগতির দিকে নজর রাখবে সরকার। জল, শক্তি, জমি ও খাদ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার ওপর নজর দেওয়া হবে এই প্রকল্পে, যাতে এই প্রকল্প থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে, জল জীবন মিশন ও সুসংহত জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। এই সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হলে SDG-6 পূরণের পথে স্থানীয় মানুষের অবদান থাকবে।

W-SHARP-এর লক্ষ্য হল... 'খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে খাদ্য নিরাপত্তা ও জল নিরাপত্তা বজায় রাখতে মহিলাদের প্রতি সংবেদনশীল ও জলবায়ুর বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।' এই প্রকল্পের সুবাদে যেভাবে মহিলা নেতৃবৃন্দ উঠে এসেছেন সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মহিলাদের সামনে রেখে এবং তাদের মাধ্যমেই বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে তারা চেঞ্জ মেকার বা পরিবর্তনের দিশারীর ভূমিকা নিয়েছেন। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে মহিলাদেরই জীবনে। এই প্রকল্পে মহিলারাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সরাসরি মোকাবিলা করেছেন এবং দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিকে তারা নতুন রূপ দিয়েছেন। W-SHARP প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত একটি ছোট্ট পদক্ষেপ অনেক বড়ো উদ্যোগের জন্ম দিতে পারে এবং এই ধরনের সমস্ত উদ্যোগ মিলিতভাবে একটি মজবুত ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী জনসমাজ গড়ে তুলতে পারে।

পরিবেশ ও প্রশাসন : রাজস্থানে ফ্লুওরোসিস মোকাবিলার কাহিনি

আধা-শুষ্ক ও জল সংকটের শিকার অঞ্চলে পানীয় জল সংগ্রহের ওপর কীভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রভাব পড়তে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হল রাজস্থান। এই রাজ্যের বেশিরভাগ অংশে সারা বছর জল থাকে এমন কোনও নদী নেই। ভূতলস্থ জলও সীমিত। তার ওপর রয়েছে শুষ্ক আবহাওয়া। এই সমস্ত কারণে এই রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরশীল। এই জল তারা পান করেন, আবার কৃষিকাজেও ব্যবহার করেন। গিনি পোকা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য জলের চিরাচরিত বিভিন্ন উৎস, যেমন পাতকুয়োগুলিকে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে জলের জোগান আরও কমে গেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল, বিশেষ করে রাজ্যের সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে ভূগর্ভস্থ জল পাওয়ার জন্য মাটি খুঁড়ে নলকূপ ও হস্তচালিত পাম্প বসানো হচ্ছে।

সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা কারণে ভূগর্ভস্থ জলের নিষ্কাশন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। তার ওপর রয়েছে লাগাতার খরা। এই সমস্ত কারণে পাথর থেকে উদ্বায়ী ফ্লুওরাইড যৌগ জলের উৎসগুলিতে মিশছে। এর ফলে পানীয় জলের মান খারাপ হচ্ছে। এই অবস্থায় জল ব্যবস্থাপনার মূল চ্যালেঞ্জ হল একই সঙ্গে জলের জোগান ও মান বজায় রাখা। ২০১৯ সালের তথ্যানুযায়ী, দেশের মোট ৭,৭৫২ ফ্লুওরাইড কবলিত জনবসতির মধ্যে ৩,৭৪৮-টিই (৫০ শতাংশ) রাজস্থানে। পানীয় জলে ফ্লুওরাইডের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র বেঁধে দেওয়া মাত্রা ১.৫ ppm-এর বেশি হলে তা থেকে ফ্লুওরাইসিস হতে পারে, বিশেষত শিশুদের। ফ্লুওরাইসিস তিন রকমের : ডেন্টাল, স্কেলেটাল ও নন-স্কেলেটাল। এই তিন ধরনের ফ্লুওরাইসিসের ক্ষেত্রে রোগের ভয়াবহতা ক্রমশই বাড়ে। এই অসুখের কোনও নিরাময় নেই। ফ্লুওরোসিস আক্রান্ত ব্যক্তির অস্থিসন্ধিগুলির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শরীরে তীব্র যন্ত্রণা হতে এমনকি এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কোমাতেও চলে যেতে পারে। SDG-6-এর লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে গেলে পরিবেশগত কারণে এই ধরনের অসুখ-বিসুখ যাতে না হয় তা দেখতে হবে। এই ধরনের সমস্যার সমাধানে সরকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিপুল অর্থব্যয়ে ফ্লুওরাইডজনিত এই সমস্যার মোকাবিলায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মেলেনি। জলকে ফ্লুওরাইড মুক্ত করার কাজেই এই ধরনের উদ্যোগগুলি সীমিত থেকেছে। আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির ওপর তেমনভাবে নজর দেওয়া হয়নি। এই ধরনের যেকোনও উদ্যোগের ক্ষেত্রেই প্রথমে জানতে শরীরে অত্যধিক পরিমাণে ফ্লুওরাইড ঢুকলে স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে সুসংহত ফ্লুওরোসিস মোকাবিলা (ইন্টিগ্রেটেড ফ্লুওরোসিস মিটিগেশন বা IFM) কৌশলের মাধ্যমে একটি সর্বাত্মক বহুক্ষেত্রীয় কর্মসূচির রূপায়ণ ঘটাচ্ছে সরকার। ২০০৭ সালে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (NEERI) ও ইউনিসেফ যৌথভাবে এই কর্মসূচি চালু করেছিল। পরবর্তীকালে রাজস্থান-সহ বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচির মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। সুসংহত ফ্লুওরোসিস মোকাবিলা কৌশল অনুসরণ করে মধ্যপ্রদেশের বাড় ও ঝাবুয়া জেলায় পরীক্ষামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। শিশুদের মধ্যে ফ্লুওরোসিসের হার কমাতে এই কর্মসূচি যথেষ্ট সফল হলেও তা সরকারের সাহায্য তেমন পায়নি। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিকে মিশিয়ে দিলে ফ্লুওরোসিস মোকাবিলার উদ্যোগ যে সফল হতে পারে তার উদাহরণও তেলেঙ্গানা ও রাজস্থান। এই সাফল্য দেখিয়ে যে বহুক্ষেত্রীয় অন্যান্য বিষয়েও এই মডেল অনুসরণ করে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

ফ্লুওরোসিস মোকাবিলার ইতিবৃত্ত

পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত ফ্লুওরাইডের অস্তিত্ব ধরা পড়ে ২০০১ সালে। তারপর থেকেই এই সমস্যার মোকাবিলায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ (PHED) একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০০৪ সালে ইউনিসেফ-এর সহযোগিতার এই বিভাগ চালু করেছে 'রাজস্থান সুসংহত ফ্লুওরোসিস মোকাবিলা প্রকল্প' (রাজস্থান ইন্টিগ্রেটেড ফ্লুওরোসিস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম বা RIFMP)। এই প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে জলকে ফ্লুওরাইড মুক্ত করতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির মাধ্যমে শোষণ প্রযুক্তির ভিত্তিতে তৈরি ডোমেস্টিক ডি-ফ্লুওরাইডেশন ইউনিট (DDFU) বিতরণ করা হয়েছে। বিপুল সহায়সম্পদ বরাদ্দ সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। তবে এই দু'টি পর্যায়ের ফলে রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে এ বিষয়ে একটা সচেতনতা তৈরি হয়েছে। প্রথম দু'টি পর্যায়ের

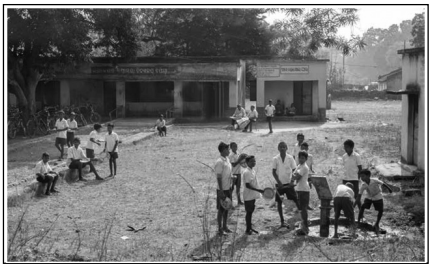

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার চালু করেছে তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে হস্তচালিত পাম্প ও নলকূপ বসানো হয়েছে, যেগুলো যুক্ত রয়েছে বৃহৎ DFU-এর সঙ্গে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকেই দশ বছরের জন্য এই ইউনিটগুলির চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শরীরে অত্যধিক ফ্লুওরাইড ঢুকলে তার পরিণাম সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে সর্বাত্মক পরিপূরক সচেতনতা প্রসার অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। জলের বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা করতে সরকারি সহায়তাপুষ্ট জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পের (NRDWP) আওতায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও ভূগর্ভের জলস্তর পূরণের বিরাট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয় মানুষের কিছু বদ্ধমূল ধারণার ফলে পানীয় জল হিসাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উদ্যোগ সফল হয়নি। রাজ্যের সর্বত্র ভূতলস্থ জলের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নিয়েছে রাজস্থান সরকার। তবে পাইপ লাইন মারফৎ জল সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থা যত দিন না করা যাচ্ছে ততদিন ভূগর্ভস্থ জল পরিশোধন করে যেতে হবে, যাতে রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দিয়ে SDG-6-এর লক্ষ্যপূরণ করা যায়।

ধারাবাহিক সমস্যা

রাজস্থানে ফ্লুওরোসিসের এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল। যত দিন যাচ্ছে তত বেশি মানুষ এর শিকার হচ্ছেন। জলের উৎস সম্বন্ধে মানুষের চিরাচরিত ধারণা বদলে জলের নিরাপত্তার দিকে যথাযথ নজর রেখে তাদের পাইপবাহিত জল ব্যবহারে উৎসাহিত করা যেতে পারে। কিন্তু জলের উৎসগুলি নির্ভরযোগ্য কিনা, সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। তার ওপর এই রকম বৃহৎ নেটওয়ার্কের ওপর নজরদারি চালানোর মতো পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য জলের উৎস চিহ্নিত করাও অত্যন্ত দুরূহ। পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে জল পরিশোধন কেন্দ্রগুলির চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব না হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। ফ্লুওরোসিস প্রবণ এলাকার সমস্ত বাসিন্দার কাছে ফ্লুওরাইড মুক্ত জল সরবরাহের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে ফ্লুওরোসিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের তেমন উপকার হবে না। পানীয় জলের চেয়ে শরীরে বেশি ফ্লুওরাইড ঢুকতে পারে জলের উৎসগুলি থেকে। রাজস্থানের ফ্লুওরোসিস প্রবণ গ্রামগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় ফ্লুওরোসিসের প্রকোপ কমেছে, কিন্তু এ বিষয়ে সচেতনতা না থাকায় প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য আচরণগত অভ্যাস বাসিন্দারা ছাড়তে পারেন না। ফলে শরীরে অত্যধিক পরিমাণে ফ্লুওরাইড ঢোকার ঝুঁকি রয়েই যায়। সামগ্রিকভাবে ফ্লুওরোসিসের মোকাবিলা করতে গেলে এই বিষয়টির ওপর নজর রাখতে হবে। ফ্লুওরোসিস মোকাবিলার উদ্যোগের দায়বদ্ধতা ও এই ধরনের বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে অনেক ফাঁকফোকর রয়ে গেছে। আর, ফ্লুওরোসিস আক্রান্ত ব্যক্তিরা যাতে এই ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পান সেজন্য তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনীহা রয়েছে।

বর্তমান চিত্র ও ভবিষ্যতের দিশা

ফ্লুওরাইড মুক্ত জল সরবরাহ করলেই ফ্লুওরোসিসের প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই সামগ্রিকভাবে এই সমস্যার মোকাবিলায় নামতে হবে। ফ্লুওরোসিস নির্মূল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এই কাজে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং ও পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী জল নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনার এই দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

রাজস্থানের দুঙ্গারপুরে ২০১৮ সালে পরীক্ষামূলকভাবে সুসংহত ফ্লুওরোসিস মোকাবিলা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচি চালু করতে রাজস্থান সরকারকে সাহায্য করেছে ইউনিসেফ। এটি একটি নাগরিককেন্দ্রিক কর্মসূচি। জেলাভিত্তিক এই কর্মসূচির নেতৃত্বে রয়েছেন জেলাশাসক। পরিকল্পিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য এই কর্মসূচি খাতে বিভিন্ন জেলার জন্য বরাদ্দ অর্থ কাজে লাগানোই জেলা শাসকদের দায়িত্ব। এই মডেলে নেতৃত্বদানের ভূমিকা জেলাশাসকের। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে ফ্লুওরোসিস মোকাবিলার উদ্যোগকে যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেজন্য জেলাশাসকরা নিজেদের ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারবেন। দুঙ্গারপুর জেলায় এই পরীক্ষামূলক কর্মসূচি সফল হয়েছে। এই কর্মসূচিতে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে ফ্লুওরোসিস মোকাবিলায় রাজ্য তথা জেলা স্তরের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের বিভিন্ন উদ্যোগকে মিশিয়ে দেওয়ার ওপর। এর ফলাফল হয়েছে ইতিবাচক। দুঙ্গারপুরে এই কর্মসূচির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্যের ফ্লুওরোসিস প্রবণ সমস্ত জেলায় আগামী চার বছরে পর্যায়ক্রমে RIFM-এ এই মডেল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজস্থান সরকার। এই মডেলে জল, স্বাস্থ্য, পুষ্টির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে ১২ বছর পর্যন্ত বয়সি শিশুদের মধ্যে থেকে ফ্লুওরোসিস নির্মূল করার যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তার সাফল্যের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

পরিবেশ রক্ষার জন্য জলের পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে হবে এই কাজে নাগরিকদের উৎসাহ দিতে হবে। সেইসঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ও জলের উৎসগুলিকে পূরণ করার উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই জলের ব্যবহার ও জলস্তর পূরণের মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখা যাবে। যাতে পরিবেশ রক্ষা পাবে। উৎসে জলের গুণামানও বজায় রাখা যাবে। একটি সুসংহত জল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটা অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সরকারের জল শক্তি অভিযানে। জল ব্যবস্থাপনায় একটা অভিন্ন মঞ্চ গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরকে এই মঞ্চে শামিল করা হয়েছে।

ভারতে পরিবেশ রক্ষায় জল ও স্যানিটেশন নীতির গুরুত্ব

পরিবেশ রক্ষা ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। নিরাপদ পানীয় জলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে যে উন্নত করা প্রয়োজন তা এবার বোঝা গেছে। পরিবেশে মানুষের শরীরের বর্জ্য পদার্থ থেকে যাওয়ায় তা থেকে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়ে যায়, যাকে বলা হয় ফিকাল ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন (FTI)। এর মূল কারণ হল খোলা জায়গায় শৌচকর্মের অভ্যাস। এছাড়া শৌচাগার নির্মাণে ত্রুটি থাকার ফলেও এই সংক্রমণ ছড়ায়। এদেশে ডায়রিয়ার জন্য যত শিশুর মৃত্যু হয় তার প্রায় ৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রেই দায়ি দূষিত পানীয় জল, বেহাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও মানুষের চিরাচরিত কিছু অভ্যেস[৪]। WHO-এর হিসাব মতো ২০১৭ সালে বিশ্বজুড়ে ম্যালেরিয়ার কারণে ৫,২৫,০০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচ বছরের কমবয়সি ১,১৭,০০০ শিশুর মৃত্যুই হয়েছে ভারতে[৫]। তাই উপযুক্ত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কাজে বিনিয়োগের পাশাপাশি পরিবেশের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী করে তোলার ওপর সমানভাবে নজর দিতে হবে।

মানুষের শরীরের বর্জ্য পদার্থ থেকে পরিবেশে দূষণ যাতে না ছড়ায় তা নিশ্চিত করার জন্য কঠিন ও তরল বর্জ্য অপসারণের যথাযথ বন্দোবস্ত করতে হবে। এর জন্য শরীরের বর্জ্য পদার্থের যথাযথ অপসারণ ও উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটি SDG-6 এরই অন্যতম অংশ যেখানে নিরাপদ পানীয় জল ও উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা রয়েছে। এর জন্য শুধুমাত্র পানীয় জল সরবরাহ বা শৌচাগারের ব্যবস্থা করলেই হবে না, উপযুক্ত কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে বিনিয়োগ করতে হবে। আর ইতিবাচক ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের জন্য একাজে শামিল করতে হবে জনসাধারণকে। তাদের বোঝাতে হবে যে তাদের কাজের দায়িত্ব তাদেরই।

জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতিসমূহ

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ২০১৯ সালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে ২০১৯-'২৯ সালের জন্য সরকার হাতে নিয়েছে জাতীয় গ্রামীণ স্যানিটেশন পরিকল্পনা (ন্যাশনাল রুরাল স্যানিটেশন স্ট্র্যাটেজি), জল জীবন মিশন এবং সংশোধিত অভিন্ন জলের গুণমান নজরদারির প্রোটোকল (রিভাইজড ইউনিফর্ম ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং প্রোটোকল)। এগুলি বিচ্ছিন্ন এক-একটি কর্মসূচি নয়, বরং সকলের কাছে পানীয় জল ও স্যানিটেশনের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত একটি সুসংহত ও সর্বাত্মক পরিকল্পনার অঙ্গ। নিচে যে সুপারিশগুলি করা হয়েছে সেগুলির কথা মাথায় রেখে এই নীতিগুলিকে যদি একত্রে রূপায়ণ করা যায়, তাহলে সহায়সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ রক্ষার কাজে অনেক দূর এগোনো যাবে।

রেট্রোফিটিং এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

২০১৪ সালে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ১০ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৫-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫.৯ লক্ষেরও বেশি গ্রাম ও ৬৯৯-টি জেলাকে ওপেন ডিফেকেশন ফ্রি বা ODF বলে ঘোষণা করা হয়েছে, অর্থাৎ এই সমস্ত জেলা ও গ্রামে আর খোলা জায়গায় শৌচকার্য হয় না। দশ বছর মেয়াদি (২০১৯-'২৯) যে গ্রামীণ স্যানিটেশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার লক্ষ্য হল খোলা জায়গায় শৌচকার্য বন্ধ করার পরও এক ধাপ এগোনো বা ODF-প্লাস তকমা অর্জন[৭]। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ-এর আওতায় মানুষের আচরণগত যে পরিবর্তন এসেছে তাকে ধরে রাখা, সকলের কাছে স্যানিটেশনের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া, নতুন পরিবারগুলিকে শামিল করা এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য অপসারণের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা করাই এই নতুন কর্মসূচির লক্ষ্য।

দেশে বিভিন্ন স্যানিটেশন কর্মসূচির আওতায় মূলত তিন রকমের শৌচাগার নির্মাণ করা হয় : সিঙ্গল লিচ পিট, টুইন লিচ পিট ও সেপটিক ট্যাঙ্ক। সিঙ্গল লিচ পিটগুলির রেট্রোফিটিং অর্থাৎ তৈরির সময় যে সুবিধা ছিল না পরে সেটা তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন, জায়গা থাকলে সিঙ্গল পিটকে হয় টুইন পিটে পরিণত করতে হবে, যাতে মানবশরীরের বর্জ্য কালক্রমে জীবাণুমুক্ত সারে পরিণত হতে পারে, নয়তো সিঙ্গল পিটগুলিকে নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুরূপভাবে সেপটিক ট্যাঙ্কের বর্জ্য তরল অপরিশোধিত অবস্থায় যাতে কোনওমতে খোলা জায়গায় পড়তে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এখানকার বেশিরভাগ সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণেও গলদ রয়েছে। এখানে শরীরের বর্জ্য পদার্থ-সহ পরিবারের যাবতীয় তরল বর্জ্য জমা হয়। অনেক সেপটিক ট্যাঙ্ক আবার কোনও খোলা নালার সঙ্গে যুক্ত। সেখান থেকে কৃষিজমি, বাড়ির উঠোন এমনকী নদীতেও এই বর্জ্য

পদার্থ মেশে। এতে জল, মাটি তো বটেই এমনকি কিছু কিছু ফসলও দূষিত হয়ে পড়ে। ভারতীয় মান অনুযায়ী, যে শৌচাগার নির্মাণ করা হয়, তার নকশাতেই ত্রুটি রয়ে যায়। তারপর সেগুলির নির্মাণ ও দেখভাল এমন করে হয় যা স্বাস্থ্যের ক্ষতি ডেকে আনে।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটা ন্যূনতম মান ও নির্দেশিকা বেঁধে দেওয়া জরুরি[৮]। এই মুহূর্তে ODF-প্লাস-এর লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে সিঙ্গল লিচ ও সেপটিক ট্যাঙ্ক দু'টিই অন্যতম বাধা। ফিকাল স্লাজ অ্যান্ড সেপট্যাজ ম্যানেজমেন্ট (FSSM)-এর পক্ষেও এগুলি অন্তরায়। শৌচাগারের রেট্রোফিটিং ও পারিবারিক ও সমষ্টিগত স্তরে শৌচাগারগুলির সাবস্ট্রাকচারের (যে অংশ মাটির নিচে থাকে) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলাদা করে কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। সেপটিক ট্যাঙ্ক যথাযথভাবে নির্মিত হলে প্রাথমিকভাবে বর্জ্যের পরিশোধন হয়ে যায়। ফলে জল ও মাটি দূষণের সম্ভাবনা অনেক কমে।

জল জীবন মিশন (JJM) এবং প্রত্যেক পরিবারে পাইপ-বাহিত জল সরবরাহ

জল শক্তি মন্ত্রক ২০১৯ সালের মার্চে জল জীবন নির্দেশিকা জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে দেশের গ্রামাঞ্চলে মাত্র ১৮.৩৩ শতাংশ পরিবারে (৩.২৭ কোটি) পাইপ বাহিত জলের সংযোগ রয়েছে। বর্তমানের হিসাব অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১৪.৬০ কোটি পরিবারের জন্য চালু জলের কলের (ফাংশনাল হাউসহোল্ড ট্যাপ কানেকশন, FHTC) ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ২০২৪ সালের মধ্যে জল জীবন মিশনের আওতায় প্রতিদিন মাথাপিছু ৫৫ লিটার জল পাওয়া যায়।

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ১৮ শতাংশ বাড়িতে চালু জলের কল রয়েছে, এবার ১০০ শতাংশ বাড়িতে এই জলের সংযোগ দিতে গেলে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও মজবুত করে তুলতে হবে, কৌশলগত পরিকল্পনা করতে হবে, নিয়মিত নজরদারির তথা উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে, স্থানীয় স্তরে সেখানকার জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি চালু পাইপ বাহিত জল সরবরাহ ব্যবস্থার নির্মাণ বা রেট্রোফিটিং-এর কাজ সম্পন্ন করে পরিবারগুলিতে জলের কলের সংযোগ দিতে হবে। এই কল বা FHTC-গুলির কার্যক্ষমতা ৪০ lcpd থেকে বাড়িয়ে করতে হবে ৫৫ lcpd। জলের চালু উৎসগুলিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। সেইসঙ্গে পানীয় জলের নির্ভরযোগ্য উৎসগুলির বিকাশ, গ্রে ওয়াটার ব্যবস্থাপনা এবং সুসংহত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে রূপায়ণকারী সংস্থাগুলিকে।

জলের গুণমান পরীক্ষা ও নজরদারির নির্দিষ্ট মাপকাঠির ব্যবস্থা

জলের উৎস, পাইপ বাহিত বিতরণ ব্যবস্থায় বা উপভোক্তাদের কাছে পৌছনোর সময় পানীয় জল নিরাপদ থাকছে কিনা তা দেখতেই জলের গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা। WHO-এর মতে জলের উৎস থেকে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছনো পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ঝুঁকির মূল্যায়ন ও তা মোকাবিলার ব্যবস্থার মাধ্যমে পানীয় জলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পন্থাই সবচেয়ে কার্যকরী[৯]। নিরাপদ পানীয় জলের জোগান নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে পূর্বতন পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক ২০১৯ সালের মার্চে প্রকাশ করেছে পানীয় জলের গুণমান নজরদারির একটি অভিন্ন প্রোটোকল (ইউনিফর্ম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং প্রোটোকল)। কার্যকরীভাবে জলের গুণমান পরীক্ষা তথা যথাযথভাবে নজরদারির ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নানান পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়া হয়েছে এই প্রোটকলে[১০]। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরীক্ষার নানা সরঞ্জাম বা ফিল্ড টেস্ট কিটের মাধ্যমে জলের গুণমানের ওপর নজরদারির পরে পরীক্ষাগারে এই ফলাফল যাচাই করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই প্রোটোকলে। সেইসঙ্গে, যে যে কারণে সরাসরি স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে সেগুলিকে চিহ্নিত করে তার যথাযথ মূল্যায়নের কথাও বলা হয়েছে এই প্রোটোকলে। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার প্রভাবও স্বাস্থ্যের ওপর পড়তে পারে। এই বিষয়টির ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিশেষে

এই দেশকে ওপেন ডিফেকেশন ফ্রি (ODF) বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে খোলা জায়গায় শৌচকার্য বন্ধ হয়েছে। এখন এই শরীরের বর্জ্য পদার্থের অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে পানীয় জলের মান খারাপ হবে। সেইসঙ্গে অনিয়মিত জল সরবরাহের কারণেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। জলের চাপের দরুন পাইপ ফেটে গেলে তাতে দূষিত জল ঢুকে যেতে পারে। যথাযথভাবে এই দু'টি সমস্যারও মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

জল জীবন মিশন বা গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য গৃহীত অন্য যেকোনও প্রকল্পকে সফল করে তুলতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েত তথা গ্রামের জল ও স্যানিটেশন কমিটিগুলিকে শামিল করতে হবে। এতে গ্রামের মানুষের দায়িত্ব বাড়বে এবং গৃহীত ব্যবস্থাগুলি দীর্ঘস্থায়ী হবে। বাসিন্দারা একবার সুফল পেতে শুরু করলে তারা স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবেন। তাই এখন সরকারকে সর্বস্তরে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে যারা এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। একমাত্র তাহলে সহায়সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Central Ground Water Board (2018). *Central Groundwater Board Yearbook 2017-2018*. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Link: http://cgwb.gov.in/ Ground-Water/Groundwater%20Year%20Book%202017-18.pdf

(২) Mallapur et. al. (2019). *Repeated Floods, Drought Affect Maharashtra, But Are Not 'Election Issue': Experts.* IndiaSpend. Link: https:/ /www.indiaspend.com/repeated-floods-drought- affect-maharashtra-but-they-are-not-an-election-issue-experts/

(৩) Jal Jeevan Mission (2019). *National Rural Drinking Water Programme Integrated Monitoring Information System (IMIS)*. Ministry of Jal Shakti. Link: https://ejalshakti.gov.in/IMISReports/ NRDWP_MIS_NationalRuralDrinkingWaterProgramme.html

(৪) Liu L, Johnson HL, Cousens S, Perin J, Scott S, Lawn JE, Rudan I, Campbell H, Cibulskis R, Li M, Mathers C, Black RE. (2012) Child Health Epidemiology Reference Group of WHO and UNICEF. *Global, regional, and national causes of child mortality: an updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000.* Lancet.

(৫) World Health Organisation (WHO). (2018). *Diarrhoea Disease*. Link: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease

(৬) UNICEF. (2019). *Report on Environmental Impact of SBM on Water, Sanitation and Food.* UNICEF. Link: https://jalshakti-ddws.gov.in/ sites/default/files/ODF_Comprehensive_Report_ Rev5.pdf

(৭) Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti. (2019). *From ODF to ODF Plus: National Rural Sanitation Strategy 2019-2029.* GoI. Link: https://jalshakti-ddws. gov.in/sites/default/files/Rural_Sanitation_Strategy_Report.pdf

(৮) IS 2470 (Part 1) (1985) Indian standard code for installation of septic tank, part I, Design Criteria and Construction, (second revision). Bureau of Indian Standard, New Delhi, Jan 1986. Pp. 4.

(৯) Guidelines for Drinking-Water Quality, Fourth Edition, published by the World Health Organization (2011) WHO.

(১০) Uniform Drinking Water Quality Monitoring Protocol, Ministry of Drinking Water and Sanitation, GOI, (March 2019).

আরও শক্তিশালী গণতন্ত্রের লক্ষ্যে নির্বাচনী সাক্ষরতা

উমেশ সিনহা

ভারতীয় সংবিধানের ৩২৬ ধারায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের ৬১তম সংশোধনীর মাধ্যমে এই ধারাকে আরও মজবুত করে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছরে নামিয়ে আনা হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন সব যোগ্য ভোটারের নাম নথিবদ্ধ করতে ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে আসছে। তারই অঙ্গ হিসাবে জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন। ২০২০ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপনের এক দশক পূর্ণ হল। প্রতি বছর এই দিনটি ভোটদান কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকা, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য সদর দপ্তরগুলিতে দেশজুড়ে ১০ লক্ষেরও বেশি স্থানে পালিত হয়। এই দিনে সমগ্র জাতি গণতন্ত্রের উৎসবে মেতে ওঠে, কোটি কোটি ভারতীয় তাদের ভোটদানের অধিকার উদ্‌যাপন করেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস ২৫ জানুয়ারি। দিনটি সারা দেশে জাতীয় ভোটার দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৫০ সালে এই দিনটি-তেই নির্বাচন কমিশন স্থাপন করা হয়েছিল।

নির্বাচনে প্রতিটি ভোটেরই মূল্য আছে। গণতন্ত্রে প্রতিটি ভোটের মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াবার লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন জাতীয় ভোটার দিবস পালন করে আসছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল নাগরিকদের, বিশেষত নতুন ভোটারদের, ভোটার তালিকায় নাম তুলতে উৎসাহিত করা। একইসঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নাগরিকরা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, তা নিয়ে সচেতনতার প্রসারেও এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

প্রতি বছর জাতীয়, রাজ্য, জেলা থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। এটি হয়ে উঠেছে বিশ্বে গণতন্ত্রের বৃহত্তম উদ্‌যাপন।

নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে দিল্লিতে জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান, উদ্ভাবন ও কৃতিত্বের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও বিশেষ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় প্রাপকদের হাতে। শ্রেষ্ঠ রাজ্য এবং সংবাদমাধ্যমকেও পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে ভোটার সচেতনতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপত্র, পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনী ব্যয় ও অর্থশক্তির আস্ফালনের ওপর নজরদারি, প্রযুক্তির ব্যবহার, ভোটার তালিকা সংশোধনের গতিপ্রকৃতি, উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ প্রভৃতি মাপকাঠির বিচার করা হয়। সার্বিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্বাচনী আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের মধ্যে সেরা প্রতিভাগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের পুরস্কৃত করাই এই বিচারের লক্ষ্য। এই দিন বহু নতুন ভোটারের (১৮+) হাতে তাদের সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়। মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের আরও বেশি সংখ্যায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন।

রাজ্য স্তরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরাও রাজ্য প্রশাসন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন, সংবাদমাধ্যম, নাগরিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যুব প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি-সহ বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল। এখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান, অসাধারণ কৃতিত্ব এবং উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

জেলা স্তরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা। ভোটারদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চায়েত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সংগঠন, সংবাদমাধ্যম, যুব সম্প্রদায়-সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বুথ স্তরের আধিকারিকরা নতুন ভোটারদের সংবর্ধনা জানান এবং তাদের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেন। নতুন ভোটারদের একটি ব্যাজ দেওয়া হয়,

[লেখক ভারতের নির্বাচন কমিশনের মহাসচিব। ই-মেল : decus@eci.gov.in]

যাতে লেখা থাকে, 'ভোটার হয়ে গর্বিত, ভোট দিতে প্রস্তুত।' ভোটারদের সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকেই শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। এই শপথবাক্যের মধ্য দিয়ে 'জেনে বুঝে ন্যায়সঙ্গত' ভোট সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

ভোটারদের শপথবাক্য

আমরা, ভারতের নাগরিকরা গণতন্ত্রের প্রতি অটুট বিশ্বাস নিয়ে আমাদের দেশকে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অব্যাহত রাখার এবং অবাধ, ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার এবং ধর্ম—বর্ণ—জাতপাত—গোষ্ঠী—ভাষা বা অন্য কোনওরকম প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে প্রতিটি নির্বাচনে নির্ভীকভাবে ভোট দেওয়ার শপথ নিচ্ছি।

প্রতি বছর জাতীয় ভোটার দিবসের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাবনা বেছে নেওয়া হয়। এই ভাবনাই কমিশনের সেই বছরের কর্মধারার মূল সুরটি বেঁধে দেয়। বিভিন্ন বছরে যেসব মূল ভাবনা ছিল সেগুলি হল :

২০১১—আরও শক্তিশালী গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অধিকতর অংশগ্রহণ;

২০১২—মহিলাদের নথিভুক্তিকরণ;

২০১৩—অন্তর্ভুক্তিকরণ;

২০১৪—ন্যায়সঙ্গত ভোটদান;

২০১৫—সহজ নথিভুক্তিকরণ, সহজ সংশোধন;

২০১৬—সর্বাত্মক ও গুণগত অংশগ্রহণ, কোনও ভোটারই যেন বাদ না পড়েন;

২০১৭—তরুণ ও ভবিষ্যৎ ভোটারদের ক্ষমতায়ন;

২০১৮—সহজে ভোটদানের ব্যবস্থা;

২০১৯—কোনও ভোটার যেন বাদ না পড়েন;

২০২০—আরও শক্তিশালী গণতন্ত্রের লক্ষ্যে নির্বাচনী সাক্ষরতা।

নির্বাচন কমিশন 'সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিমাফিক ভোটারদের শিক্ষাদান ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কর্মসূচি', SVEEP-এর আওতায় নির্বাচনী সাক্ষরতার পাঠ দিতে শুরু করেছে। এজন্য অষ্টম জাতীয় ভোটার দিবসের প্রাক্কালে দেশজুড়ে প্রায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার নির্বাচনী সাক্ষরতা ক্লাব, নির্বাচনী পাঠশালা এবং ভোটার সচেতনতা ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এই মঞ্চগুলি জনসংখ্যার নির্দিষ্ট অংশকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করাচ্ছে। নির্বাচনী সাক্ষরতা ক্লাবগুলি স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। নির্বাচনী পাঠশালাগুলি এক-একটি গোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করে আর ভোটার সচেতনতা ফোরামগুলি কাজ করে সরকারি দপ্তর-সহ বিভিন্ন সংগঠনে।

ভোটের সর্বজনীন সমানাধিকারের ধারণা এসেছে সংবিধানের ৩২৬ ধারা থেকে। এই ধারণা আরও মজবুত হয়েছে সংবিধানের ৬১তম সংশোধনীতে, যার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ন্যূনতম বয়ঃসীমা কমিয়ে আনা হয়েছে ১৮-তে। সব যোগ্য ভোটদাতা যাতে ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন সেজন্য নির্বাচন কমিশন ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে আসছে। তা সত্ত্বেও ভোটারদের একাংশের, বিশেষত নতুন ভোটারদের অনীহা এবং ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সমাজের কিছু অংশের অনিচ্ছা এক্ষেত্রে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। ২০১০ সালে হীরকজয়ন্তী বর্ষপূর্তির সময়ে কমিশন, ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং এবিষয়ে বিশেষত নতুন ভোটারদের আগ্রহ নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করে।

দেশজুড়ে প্রতিটি এলাকায় বুথ ধরে ধরে কতজন ১৮ বছর পূর্ণ করে নতুন ভোটার হচ্ছেন, প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারিতে তা চিহ্নিত এবং নথিভুক্ত করে, জাতীয় ভোটার দিবস, অর্থাৎ, ২৫ জানুয়ারিতে তাদের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তরুণ প্রজন্ম যাতে নাগরিকত্বের আস্বাদ পায়, তাদের ক্ষমতায়ন হয় এবং তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে গর্ব অনুভব করেন, তা সুনিশ্চিত করাই এই প্রয়াসের লক্ষ্য। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের, বিশেষত তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এই প্রয়াসের জেরে যে ফল পাওয়া গেছে, তা উৎসাহব্যঞ্জক।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ৬৭.৪৭ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ২০১৪ সালে এই হার ছিল ৬৬.৪৪ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ৫৮.১৯ শতাংশ। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশে নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮৩ কোটি ৪০ লক্ষ। ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে তা বেড়ে হয় ৯১ কোটি। অর্থাৎ, ভোটারের সংখ্যা বেড়েছিল ৭ কোটি ৪৬ লক্ষ। এর মধ্যে মহিলা ৪ কোটি ৭ লক্ষ এবং পুরুষ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ।

তাছাড়া, ২০১৯ সালের নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়ে ঐতিহাসিক ৬৬.৭৯ শতাংশে পৌঁছেছে। পুরুষ ও মহিলা ভোটদাতার ফারাক কমে মাত্র ০.০১ শতাংশ হয়েছে, যা ২০১৪ সালে ছিল ১.৪৬ শতাংশ। সহজে ভোটদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে দেখা গেছে, ভোটার তালিকায় ৬২ লক্ষ দিব্যাঙ্গজন রয়েছেন।

বর্তমানে মোট নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৯১ কোটি। ১৯৫০ সাল থেকে নির্বাচন কমিশন তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে আসছে। কমিশনের পরিচালনাধীন নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিশ্বের সব গণতন্ত্রের সম্ভ্রম ও স্বীকৃতি আদায় করেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১০ লক্ষেরও বেশি ভোটদান কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটকর্মী।

গণতন্ত্র ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কেন্দ্র-বিন্দুতে রয়েছেন ভোটাররা। জাতীয় ভোটার দিবস ভোটারদের, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং গণতন্ত্রে উভয়ের অবদান ও অপরিহার্যতা নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।

এই দিনটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রধান স্তম্ভ ভোটার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করে। জাতীয় ভোটার দিবস এখন গণতন্ত্র উদ্‌যাপনের এক বার্ষিক প্রাতিষ্ঠানিক উৎসবে পর্যবসিত হয়েছে।❑

যোজনা ? ক্যুইজ

১। মহাকাশে মহিলাদের দীর্ঘতম ফ্লাইটের নজির গড়েছেন কোন মহাকাশচারী?

২। সম্প্রতি আবিষ্কৃত Importin-11 নামক প্রোটিন কোন রোগের সঙ্গে যুক্ত?

৩। টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম ৭ হাজার রান কে করেছেন?

৪। Shijian-20 কোন দেশের ভারীতম স্যাটেলাইট?

৫। কোন দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার অনুমোদনে সাইবার অপরাধ রোধের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া চুক্তি বানিয়েছে?

৬। এশীয় পরিকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, Asian Infrastructure Investment Bank-এর সদর দপ্তর কোন দেশে?

৭। কোন রাজ্যের মন্ত্রীসভা 'বৈদ্যুতিক যান নীতি, ২০১৯'-এ সায় দিয়েছে?

৮। "Colours of the Mountain" বইটির লেখক সম্প্রতি মারা গেছেন। তার নাম কী?

৯। ভিস্টাডোম কোচ-বিশিষ্ট 'হিম দর্শন এক্সপ্রেস' কোন কোন জায়গার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে?

১০। পর্যটকদের কাছে টানতে 'মাণ্ডু উৎসব' কোন রাজ্যে শুরু হয়েছে?

১১। ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের নিরিখে এই দেশে কোন ব্যাঙ্ক সেরার শিরোপা পেয়েছে?

১২। সদ্য 'অবসরপ্রাপ্ত' MiG 27-এর অন্য নাম কী?

১৩। যুক্তরাজ্য ও মরিশাসের মধ্যে কোন জায়গা নিয়ে বিবাদ চলছে?

১৪। ২০২০ সালকে 'সুশাসন সংকল্প বর্ষ' হিসেবে কোন রাজ্য উদ্‌যাপন করছে?

১৫। "Seng Khasi" ধর্মাবলম্বীদের কী বলা হয়?

১৬। তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ভারতের কোন রাজ্যে নয়া বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবে?

১৭। এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র তিনটি দেশ পোলিও নির্মূলীকরণে ব্যর্থ। তাদের নাম কী?

১৮। 'Falcon Capital of the World' কোন জায়গা বলা হয়?

১৯। ভারতে শুধু একটি প্রজাতির বনমানুষ বা 'এপ' পাওয়া যায়। কোন প্রজাতি?

২০। ২০০৪ সালে যে সুনামি ভারতে আছড়ে পড়ে তার উৎপত্তি কোথায়?

২১। রোহতাং পাসের সম্প্রতি নয়া নামকরণ হয়েছে। কার নামে এটি নামাঙ্কিত হয়েছে?

২২। চৌখাণ্ডি স্তুপা কোথায়?

২৩। জাতীয় ক্রেতা দিবস (National Consumer Day) কবে?

২৪। রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন প্রকল্প (UNDP)-এর মতে আফ্রিকার মধ্যে কোন দেশে আয়ের বৈষম্য সবচেয়ে প্রকট?

২৫। Nord Stream 2 দুই দেশের মধ্যে একটি গ্যাসের পাইপলাইন। কোন কোন দেশ?

উত্তর :

১. নাসার ক্রিস্টিনা কোচ। ২. কোলোরেকটাল ক্যান্সার। ৩. স্টিভ স্মিথ। ৪. চিন। ৫. রাশিয়া। ৬. চিন। ৭. দিল্লি। ৮. দা চেন। ৯. কালকা ও সিমলা। ১০. মধ্যপ্রদেশ। ১১. অন্ধ্র ব্যাঙ্ক। ১২. বাহাদুর। ১৩. চাগোস দ্বীপ। ১৪. হিরয়ানা। ১৫. "Hynniew Trep"। ১৬. উত্তরপ্রদেশ। ১৭. পাকিস্তান, নাইজিরিয়া ও আফগানিস্তান। ১৮. নাগাল্যান্ড। ১৯. Hoolock Gibbon। ২০. সুমাত্রা দ্বীপ। ২১. প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ২২. উত্তরপ্রদেশে। ২৩. ২৪ ডিসেম্বর। ২৪. দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৫. রাশিয়া ও জার্মানি।❑

সাহিত্য অকাদেমি

মোট ২৩-টি ভাষায়, ২০১৯ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষিত হল গত ১৮ ডিসেম্বর। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে দেওয়া হয় শাল এবং নকশা করা তাম্রপাত্র। সেই নকশার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে সাহিত্য অকাদেমির এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রবন্ধ সংকলন 'ঘুমের দরজা ঠেলে'-র জন্য বাংলা বিভাগে এই পুরস্কার পেলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ফরাসি সাহিত্য বিশেষজ্ঞ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য চিন্ময় গুহ। বাংলা বিভাগে জুরির ভূমিকায় ছিলেন বাণী বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায় এবং ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য। বিশ্ব সাহিত্যের প্রায় ষাটজন দিকপালের সঙ্গে লেখকের কাল্পনিক সংলাপ এই বইয়ের বিষয়। এতে স্থান পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ার, কোলরিজ, তলস্তয়, য়্যুগো, বোদল্যের, রোম্যা রোলাঁর মতো বিশিষ্টজনেরা।

এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যাসাগর পুরস্কার, লীলা রায় পুরস্কার, ডিরোজিও দ্বিশতবার্ষিকী পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। 'দেশ' ও 'বইয়ের দেশ' পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনার সম্পাদনা করেছেন এক দশক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক চিন্ময় গুহের ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি সুবিদিত। ফ্রান্সের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দপ্তর তাকে ২০১০ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে 'অর্ডার অব অ্যাকাডেমিক পাম' এবং 'অর্ডার অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স' সম্মানে ভূষিত করেছিল। এবছর ফরাসি সরকারের অন্যতম শীর্ষ সম্মান 'ন্যাশনাল অর্ডার অব মেরিট'-ও পেয়েছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ এবং বিশিষ্ট লেখক শশী থারুর ইংরেজি বিভাগে এই পুরস্কার পেলেন তার বই 'অ্যান এরা অব ডার্কনেস : দ্য ব্রিটিশ ইন ইন্ডিয়া'-র জন্য। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব নিয়ে তার এই বই। ব্রিটিশ শাসনে কীভাবে ভুগতে হয়েছিল আমাদের, কীভাবে ব্রিটিশরা আমাদের শোষণ করেছিল, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে পুরস্কৃত বইটিতে। এই বিভাগে অন্যতম জুরি ছিলেন সুকান্ত চৌধুরী। থারুর, তিন দশকে প্রায় কুড়িটি বই লিখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান নভেল', 'শো বিজনেস', 'হোয়াই আই অ্যাম আ হিন্দু' এবং 'দ্য পারাডক্সিকাল প্রাইম মিনিস্টার'। লন্ডনে জন্ম। ১৯৭৫ সালে গ্র্যাজুয়েট হন দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পিএইচডি করেন ১৯৭৮-এ। টাফট্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লেচার স্কুল অব ল' অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি থেকে।

প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তের স্ত্রী জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত পুরস্কার পেলেন তার উপন্যাস 'চাণক্য'-র জন্য। হিন্দিতে লেখা কবিতার বই 'ছিলাতে হুয়ে আপনে কো'-র জন্য পুরস্কৃত হলেন কবি নন্দকিশোর আচার্য। আর সাঁওতালি ভাষায় লেখা ছোটো গল্পের বই 'শিশিরজালি'-র জন্য সাহিত্য অকাদেমি পেলেন গল্পকার কালীচরণ হেমব্রম।❑

সূত্র : http://sahitya-akademi.gov.in

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : 'এই সময়' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'

যোজনা ডায়েরি

(ডিসেম্বর ২০১৯)

আন্তর্জাতিক

● **লন্ডনে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা :**

সরকারিভাবে লন্ডনে ইংরেজির বাইরে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেল বাংলা। তার পরেই রয়েছে পোলিশ ও তুর্কি ভাষা। লন্ডনে বসবাসকারী ৩ লক্ষ ১১ হাজার ইংরেজি না বলা মানুষের মধ্যে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার মানুষ কথা বলেন এই তিন ভাষায়। তার মধ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যাই প্রায় ৭১,৬০৯। সম্প্রতি লন্ডনেরই সিটি লিট নামে একটি সংস্থার সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই চমকপ্রদ তথ্য এবং এর ফলে লন্ডনে বসবাসকারী ব্রিটিশরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিজেদের যোগাযোগ বাড়াতে পারছেন না, এমন সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন গবেষকরা। কারণ, সমীক্ষায় বলছে লন্ডনবাসী ব্রিটিশদের মাত্র ৮ শতাংশ মাতৃভাষার বাইরে অন্য কোনও ভাষা সড়গড়ভাবে বলতে পারেন। যদিও এই সমীক্ষা ও গবেষণার অন্যতম কারণই হল লন্ডনের ভাষাগত ও সামাজিক বৈচিত্র্য তুলে ধরে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতির মধ্যে মেলবন্ধন বাড়ানো। তাতেই দেখা যাচ্ছে, লন্ডন শহরের তিন প্রান্তে ইংরেজির পরেই সব থেকে বেশি যে ভাষায় মানুষজন কথা বলেন, সেটা বাংলা। অথচ মজার বিষয়, ব্রিটিশদের মাত্র ৩ শতাংশ বাংলায় সড়গড়ভাবে কথা বলতে পারেন বলে জানানো হয়েছে সমীক্ষায়।

● **বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী :**

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। সেই জন্যই শিরোনামে রয়েছেন ফিনল্যান্ডের ৩৪ বছরের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান সানা মারিন। গত ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ফিনল্যান্ডের শাসকদল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাউন্সিল ভোটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য সানাকে বেছে নেয়। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টি রিনের থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। গত এপ্রিলের নির্বাচনে অবশ্য তার দল অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের উপরই আস্থা রেখেছিল জনতা। কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রিন ডাককর্মীদের পারিশ্রমিক কমানোর পরিকল্পনা করলে ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা যাদের সঙ্গে জোট তৈরি করে সরকার গড়েছিল, তাদের অন্যতম সেন্টার পার্টি জানিয়ে দেয় তারা রিনের উপর ভরসা হারিয়েছে। ফলে পদত্যাগ করেন রিন।

তবে যেহেতু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বৃহত্তম দল, তাই তাদের আইনি ক্ষমতা রয়েছে, নিজের দলের কোনও সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করার। মারিন সেই দলের উপপ্রধান। তা বাদে ২০১৫ সাল থেকে আইনপ্রণেতা হিসেবে কাজ করে এসেছেন। সাম্প্রতিক দফায় পরিবহণ ও যোগাযোগ মন্ত্রী পদে কর্মরত ছিলেন। নয়া জোটের বাকি চার দলের প্রত্যেকটিরই নেতৃত্বে মহিলারা। তিনজনের বয়স আবার ৩৫-এর নিচে। অবশ্য, ইতিহাস বলছে, এর আগে মাত্র দু'জন মহিলা প্রধানমন্ত্রীর পদ সামলেছেন, তাও স্বল্পমেয়াদে। উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নে বর্তমানে সভাপতির পদটি ফিনল্যান্ডের।

● **ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমপিচমেন্টের পক্ষে সায় :**

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমপিচমেন্টের পক্ষেই সায় দিল হাউস অব রিপ্রেসেন্টিটিভ। এই নিয়ে তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেনেটে ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি হতে চলেছেন ট্রাম্প। এর আগে ১৮৬৮ এবং ১৯৯৮-তে ইমপিচ করা হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসন এবং বিল ক্লিনটনকে। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ইমপিচ করা হবে কিনা তা নিয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর হাউস অব রিপ্রেসেন্টেটিভ-এ ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে দীর্ঘ ১১ ঘণ্টা উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটই ট্রাম্পের ইমপিচমেন্টের পক্ষেই যায়। হাউস অব রিপ্রেসেন্টেটিভে মোট ২৩০-টি ভোট পড়েছিল। তার মধ্যে ১৯৭-টি ভোটই ট্রাম্পের ইমপিচমেন্টের পক্ষে গিয়েছে। এখানে ডেমোক্র্যাটরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে রিপাবলিকানরা এঁটে উঠতে পারেননি। ফলে এখন গোটা বিষয়টাই নির্ভর করছে সেনেটের উপর। সেখানেও যদি ভোট ট্রাম্পের বিপক্ষে যায়, তাহলে পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়ানোর আগেই সরে যেতে হতে পারে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে।

আমেরিকার কোনও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যথেচ্ছাচার, প্রতারণা এবং কোনও গুরুতর অপরাধের অভিযোগ যদি ওঠে এবং আইনসভার বেশিরভাগ সদস্যই যদি তার পরিপ্রেক্ষিতে বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে প্রেসিডেন্টকে পদ থেকে অপসারণ করার ক্ষমতা রয়েছে কংগ্রেসের। এটাই হল ইমপিচমেন্ট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধেও বেশকিছু গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। যেমন, ক্ষমতার অপব্যবহার, কংগ্রেসের কাজে বাধা দেওয়া, ইউক্রেনকে সেনা সহযোগিতায় বাধাদান এবং প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বিইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর জন্য প্রশাসনকে চাপ দেওয়া ইত্যাদি।

জাতীয়

➢ গত ২৯ ডিসেম্বর। রাঁচি। ঝাড়খণ্ডের ১১তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হেমন্ত সোরেনের শপথগ্রহণ।

➢ প্যান-আধার যোগের চূড়ান্ত সময়সীমা তৃতীয়বারের জন্য বাড়িয়ে আগামী বছর ৩১ মার্চ করল কেন্দ্রীয় সরকার। ৩১ ডিসেম্বরই ওই সময়সীমা শেষ হওয়া নির্ধারিত ছিল। কিন্তু, গত ৩০ ডিসেম্বর সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি) এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, প্যান-আধার যোগের চূড়ান্ত সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ মার্চ, ২০২০ করা হয়েছে।

● **২০২১ থেকে সর্বভারতীয় জয়েন্টের প্রশ্ন অন্য ভাষাতেও :**

সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রশ্নপত্র ২০২১ থেকে বাংলা-সহ ১১-টি ভাষায় তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক রাজ্য স্কুলশিক্ষা দপ্তরে ইতোমধ্যে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে। বাংলার পাশাপাশি অসমিয়া, কন্নড়, মারাঠি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু এবং উর্দুতে প্রশ্নপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত। ২০২১ থেকে জয়েন্ট (মেন)-এ এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ২০২০-র পরীক্ষা যদিও কেবল শুধু হিন্দি, ইংরেজি এবং গুজরাটিতে হচ্ছে।

● **নারী সাফল্যে নৌসেনায় নয়া ইতিহাস :**

নারী সাফল্যে নতুন পালক। ভারতীয় নৌসেনা পেল তাদের প্রথম মহিলা বিমানচালককে, সাব লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গী। এতদিন নৌসেনায় চিকিৎসক বা অবজার্ভার হিসেবে মহিলাদের উপস্থিতি থাকলেও মহিলার হাতে নৌসেনার বিমানের ককপিটের ভার এই প্রথম। বিহারের মুজফফরপুরের মেয়ে, বছর চব্বিশের শিবাঙ্গী প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে গত বছর ভারতীয় নৌসেনায় যোগ দিয়েছেন। গত পয়লা ডিসেম্বর কোচি নৌসেনা ঘাঁটিতে অপারেশনাল ডিউটিতে যোগ দিলেন তিনি। শিবাঙ্গী অবশ্য এখন সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেবেন না। পরিবহণ এবং সমুদ্রপথে নজরদারির জন্য ব্যবহৃত ডর্নিয়ার বিমান চালানোর দায়িত্ব বর্তেছে তার উপর। উদ্ধার কাজ থেকে শুরু করে নৌসেনা পরিবহণ, সমুদ্রপথে নজরদারি চালিয়ে সন্দেহজনক কিছু দেখলে জাহাজে খবর পাঠানো, এসব কাজ করতে হবে তাকে। যুদ্ধবিমান পরিবহণকারী জাহাজে নয়, সমুদ্রতীরেই ল্যান্ডিং করবেন তিনি।

● **কর্ণাটকে উপনির্বাচনের ফল :**

যে উপনির্বাচনের ফলে তার সরকারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করেছিল, সেই ভোটেই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা প্রার্থী করেন দল বদলে আসা ১৩ জন বিধায়ককে। তাদের অধিকাংশই জিতলেন। ১৫-টির মধ্যে ১২-টি আসনে জয় পেল বিজেপি। উলটো দিকে, হাতে থাকা ১০-টির মধ্যে ৮-টি আসন হারল কংগ্রেস।

● **নয়া সেনাপ্রধান নারাভানে :**

নতুন বছরে সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। ডিসেম্বর মাসের শেষে অবসর নিচ্ছেন সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। তার স্থলাভিষিক্ত হবেন বর্তমানে সেনার উপ-প্রধান নারাভানে। সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের দায়িত্ব সামলানো নারাভানে গত সেপ্টেম্বরে উপ-সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছেন। চার দশকের কেরিয়ারে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নারাভানে উত্তর-পূর্ব এবং জম্মু-কাশ্মীরের দায়িত্বও সামলেছেন।

● **১২৫ কোটি আধার কার্ড :**

১২৫ কোটি আধার কার্ড ইস্যু করেছে ইউআইডিএআই। গত ২৭ ডিসেম্বর এই তথ্য জানিয়ে সংস্থাটি বলেছে, আধার বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন ব্যবস্থা এবং দেশের ১২৫ কোটি নাগরিককে ওই কার্ড ইস্যু করা একটি রেকর্ড। ইউআইডিএআই-এর হিসাব অনুযায়ী, নভেম্বর মাসের শেষে দেশে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩৫.৪ কোটি। অর্থাৎ, প্রায় ৯০ শতাংশ নাগরিকই আধার পেয়েছেন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৩৭,০০০ কোটি লেনদেনের ক্ষেত্রে আধার যাচাই হয়েছে বলেও সংস্থাটি জানিয়েছে। বর্তমানে, দৈনিক ৩ কোটি আধার যাচাইয়ের অনুরোধ আসে ইউআইডিআই কর্তৃপক্ষের কাছে। ৩৩১ কোটি আধার তথ্য ইতোমধ্যেই আপডেট করা হয়েছে এবং প্রতিদিন ৩-৪ লক্ষ আধার আপডেট অনুরোধ জমা পড়ছে।

● **চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ পদে বিপিন রাওয়াত :**

সেনাপ্রধান হিসেবে তার অবসর নেওয়ার কথা ৩১ ডিসেম্বর। ঠিক তার আগের দিন সরকারের তরফে ঘোষণা করা হল, 'চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ' পদে নিয়োগ করা হয়েছে জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে। দেশের সর্বপ্রথম চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বা সিডিএস হিসেবে এবার থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রধান সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। নবগঠিত সামরিক বিষয়ক দপ্তরের প্রধান পদেও থাকবেন সিডিএস। তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় রাখতেই ওই দপ্তরের প্রধানের দায়িত্বে থাকবেন সিডিএস।

পশ্চিমবঙ্গ

● **কেন্দ্রের রিপোর্টে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ :**

স্কুলশিক্ষায় রাজ্য সরকারের একাধিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসায় কেন্দ্র। বিশেষত সব স্কুল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য সম্বলিত 'বাংলার শিক্ষা' নামে ওয়েব পোর্টাল তৈরির যে উদ্যোগ রাজ্য নিয়েছে, সেই প্রয়াস সময়োপযোগী বলে মনে করছে কেন্দ্রের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। পড়ুয়াদের জন্য কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী প্রকল্প, স্কুল ব্যাগ ও জুতো দেওয়া এবং খুদে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লকার, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, নির্মল বিদ্যালয় অভিযান, শূন্য পদে নজরদারিতে অনলাইন পদ্ধতি, গ্রামাঞ্চলের স্কুলে মোবাইল সায়েন্স প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে 'উপযুক্ত' ভূমিকা নেওয়া হয়েছে বলেও স্বীকার করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল বোর্ড (প্যাব) রাজ্যের ন'টি প্রকল্পকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

প্রথমত, স্কুলশিক্ষা দপ্তর 'বাংলার শিক্ষা' নামে এক জানালা নীতি গ্রহণ করেছে। যার মাধ্যমে রাজ্যের সব স্কুলকে একটি ছাতার তলায় এনে যাবতীয় তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ। এর ফলে যেকোনও পরিসংখ্যান সহজেই পাওয়া যায়। পাশাপাশি চলে যথাযথ নজরদারি। রাজ্যের যেকোনও প্রান্তে সরকারি, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং পোষিত স্কুলে বিষয়, মাধ্যম, ভাষা এবং স্থানভিত্তিক স্কুলে শূন্য শিক্ষক পদের তালিকা একযোগে পেতে 'অনলাইন ভ্যাকেন্সি মনিটরিং সিস্টেম' চালু করার পাশাপাশি একাধিক সামাজিক প্রকল্পও শুরু করা হয়েছে।

এ বছরের মার্চ পর্যন্ত 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পে ১৫ লক্ষেরও বেশি ছাত্রী সুযোগ পেয়েছে বলে রিপোর্টে দাবি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণের পর বিয়ে হওয়ার আগে পর্যন্ত পড়াশোনা করলে তাদের বিশেষ 'ইনসেনটিভ' দেওয়া হচ্ছে। এতে অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান-সম্ভাবনা ও শিশুর মৃত্যু রোধ করা গিয়েছে। স্কুল ছুট ঠেকাতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ুয়াদের নথিভুক্তি বাড়াতে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের মাধ্যম ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। এমনকী ২০১৮-'১৯ শিক্ষাবর্ষে

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ৫৭ লক্ষ পড়ুয়াকে স্কুল ব্যাগ ও প্রাথমিকের ৫১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে জুতো দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, সপ্তম-অষ্টম-নবম-একাদশের পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। এই প্রকল্পে রাজ্যের আর্থিক সহায়তায় ৩,৯১৮-টি স্কুলের ৪,৭০,১৬০ জন পড়ুয়া উপকৃত।

● **দারিদ্র্য দূরীকরণের নজির বাংলার :**

দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে সারা দেশের মধ্যে সাফল্যের নজির গড়ল বাংলা। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। দপ্তরের অধীনে ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১১-'১২ এবং ২০১৭-'১৮ সালের মধ্যে রাজ্যে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় যখন দারিদ্র্য বাড়ছে, তখন বাংলায় দ্রুত হারে গরিবি কমছে। এনএসও-র সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে, বাংলায় দারিদ্র্যের হার ৬ শতাংশ কমেছে। গত পাঁচ বছরে বাংলায় সার্বিক দারিদ্র্যের হার কমে হয়েছে ১৩.৯৮ শতাংশ।

দারিদ্র্য হটানোর কাজে বাংলার থেকে এক ধাপ পিছনে গুজরাট। গুজরাটে এই সময়ের মধ্যে ৫ শতাংশ দারিদ্র্য কমেছে। একই সারিতে রয়েছে তামিলনাড়ু রাজ্য। সেখানেও ৫ শতাংশ দারিদ্র্য কমেছে। মহারাষ্ট্রের মতো সমৃদ্ধশালী রাজ্যে দারিদ্র্যের হার কমার বদলে ৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। গোটা দেশেই গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের হার ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ, গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার এক ধাক্কায় ৪ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। যদিও দেশের শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার ৫ শতাংশ কমেছে।

● **বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন :**

গত ১১ ডিসেম্বর বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভের প্রথম দিন একগুচ্ছ লগ্নি প্রস্তাব পেল রাজ্য। এর মধ্যে রয়েছে আইটিসি-র ১৭০০ কোটির প্রস্তাব, জার্মানির কেএফডব্লিউ ব্যাঙ্কের ৭৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘোষণা, দিঘায় অম্বুজা গোষ্ঠীর পাঁচতারা হোটেল, দিঘাতেই হায়াতের চার তারা হোটেল, আবাসনে সিঙ্গাপুরের ইনফ্রাকো এশিয়ার লগ্নি। আইটিসি-কর্তা অতুল ভাল্লা জানান যে তারা পশ্চিমবঙ্গে ১৭০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে; পার্সোনাল কেয়ার পণ্য উৎপাদন কারখানা, ত্রিবেণীতে ডেকর পেপার তৈরির কারখানা, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কয়েকটি কারখানা সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। উলুবেড়িয়ায় প্যাটন গোষ্ঠী ৩০০ কোটি টাকায় যে শিল্প-পার্ক গড়ছে, সেখানেই ৩১ একর জমিতে পার্সোনাল কেয়ার পণ্য তৈরির কারখানা গড়বে আইটিসি। মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা যে ১৫০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়বে, সেখানে ৭৫০ কোটি লগ্নি করবে একএফডব্লিউ ব্যাঙ্ক। অণ্ডালে আর্থিকভাবে দুর্বলদের জন্য আবাসন গড়বে ইনফ্রাকো এশিয়া। উত্তরপাড়ায় টিটাগড় ওয়াগনস্ মেট্রো রেল কোচ নির্মাণের কারখানা গড়বে। এদিন 'দিঘাশ্রী' কনভেনশন সেন্টারের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রিমোটের মাধ্যমে তাজপুর বন্দরের সাইট অফিস উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগামী দুই থেকে তিন বছরে রাজ্যে ২৫ লক্ষের বেশি নতুন কর্মদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যে দেউচা পাচামি খনি থেকে কয়লা উৎপাদনের পাশাপাশি রাজ্য সরকার ত্রাণে বিলি করার জন্য সমস্ত শাড়ি, বিছানার চাদর ইত্যাদি স্থানীয় তাঁতিদের থেকে কিনবে। গত ১২ ডিসেম্বর দিঘায় বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভ-এর সমাপ্তি অধিবেশনে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতালর নুঙ্গিতে একটি পোশাক তৈরি করার হারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অর্থ ও শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রী অমিত মিত্র জানান, সেখানে মোট ১৫০-টি কারখানা গড়ে উঠবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে ১৬,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য, আগামী বছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বরে।

● **১০০ দিনের কাজে রাজ্যকে স্বীকৃতি কেন্দ্রের :**

একশো দিনের কাজে নজির সৃষ্টি করে আরও একবার রাজ্য সরকারকে সার্টিফিকেট দিল কেন্দ্র। এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের 'পারফরম্যান্সে' দেশের প্রথম দুই জেলার শিরোপা জুটেছে পশ্চিমবঙ্গের। প্রথম স্থানে আছে বাঁকুড়া, দ্বিতীয় কোচবিহার। একশো দিনের কাজে দেশের সেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিরোপা পেয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি ব্লকের বাবুর মহল। কেন্দ্রের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। একশো দিনের কাজে উদ্ভাবনী প্রকল্পের কারণে এ নিয়ে পরপর চারবার কেন্দ্রের তরফে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেল পশ্চিমবঙ্গ।

অর্থনীতি

➢ ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডে তাদের ৮৫. শতাংশ অংশিদারিত্ব বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (এসবিআই)। ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডে এসবিআই-এর মোট ১৮.৫ শতাংশ অংশিদারিত্ব রয়েছে। ওই সংস্থায় সমপরিমাণ অংশিদারিত্ব রয়েছে এলআইসি, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব বরোদারও। সেবির নির্দেশ অনুযায়ী, এসবিআই-এর নিজের মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবসা থাকার কারণে তারা ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডে ১০ শতাংশ বেশি অংশিদারিত্ব রাখতে পারবে না।

● **কয়লা উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ড ইসিএল-এ :**

কয়লা খনি জাতীয়করণের পর গত নভেম্বরে মাসের নিরিখে রেকর্ড উৎপাদন করেছে ইসিএল। এই মাসে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ৪.৩৪ মিলিয়ন টন। এই সময়েই উত্তোলিত মাটি, পাথর, ওভার বার্ডেনের পরিমাণ ১৪.৩ মিলিয়ন টন। কিন্তু একটি মাসে সর্বকালীন রেকর্ড হলেও তা সার্বিকভাবে লক্ষ্যমাত্র পূরণে যথেষ্ট নয়, বলে মনে করা হচ্ছে। এর পিছনে মূল কারণ বৃষ্টি। গত অর্থবর্ষে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০ মিলিয়ন টন। চলতি আর্থিক বছরে লক্ষ্যমাত্রা ৫৩.৫ মিলিয়ন টন। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত উৎপাদন ২৮.৪ মিলিয়ন টন।

● **নভেম্বরে জিএসটি আদায় :**

তিন মাস পর নভেম্বরে ফের এক লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি পার হল জিএসটি আদায়। গত মাসে জিএসটি আদায় হয়েছে ১,০৩,৪৯২ কোটি টাকা। গত বছর ওই পরিমাণ ছিল ৯৭,৩৬৭ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি কর আদায় হয়েছে এ বছরের নভেম্বর মাসে। সেই তুলনায়, অক্টোবরে কর আদায় কমেছিল ৫.৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সবচেয়ে কম জিএসটি আদায় হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে, ৯১,৯১৬ কোটি টাকা। ওই দুই মাস কর আদায় গত বছরের তুলনায় কমে যাওয়ার পর নভেম্বরে আবার বেড়েছে। ২০১৭ সালের পয়লা

জুলাই থেকে সারা দেশে নতুন পরোক্ষ কর ব্যবস্থা জিএসটি শুরু হওয়ার পর এই নিয়ে আটবার মাসিক জিএসটি আদায় ১ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি পার হল, চলতি অর্থবছরে চারবার।

● **বেতন বৃদ্ধি নিয়ে সমীক্ষা :**

নতুন বছরে চাকুরিজীবীদের জন্য আশার বার্তা শোনাচ্ছে কর্ন ফেরি গ্লোবাল স্যালারি ফোরকাস্টের সাম্প্রতিক প্রকাশিত রিপোর্ট। যেখানে দাবি করা হয়েছে, আগামী বছরে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে তালিকার শীর্ষে থাকবে ভারত, যেখানে কর্মীদের বেতন গড়ে ৯.২ শতাংশ হারে বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৯ সালের ১০ শতাংশের তুলনায় গড় বেতন বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস অঙ্কের বিচারে সামান্য কমলেও, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও মূল্যবৃদ্ধির পর নিট বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ ৫.১ শতাংশ হবে বলেই মতপ্রকাশ করেছেন কর্ন ফেরির সমীক্ষককেরা। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এশিয়ায় সম্ভাব্য বেতন বৃদ্ধির তালিকায় (মূল্য বৃদ্ধির আগে) ভারতের পরেই রয়েছে ইন্দোনেশিয়া (৮.১ শতাংশ) এবং চিন (৬ শতাংশ)।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বিশ্বজুড়ে গড়ে বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৪.৯ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে গড়ে মূল্য বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, আদতে নিট বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ ২.১ শতাংশে থেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা ভারতের তুলনায় অনেকটাই কম। সমীক্ষা সংস্থার দাবি আগামী বছরে ভারতে ৫.১ শতাংশ হারে গড় বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিশ্বের নিরিখে তালিকার উপরের দিকেই থাকবে। তুলনায় দেখতে গেলে উত্তর আমেরিকার ক্ষেত্রে এই অঙ্ক ১.১ শতাংশ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির ক্ষেত্রে ২.৬ শতাংশ এবং পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে ১.২ শতাংশ।

● **'উড়ান' প্রকল্পে অগ্রগতি :**

আঞ্চলিক বিমান সংযোগ বা 'উড়ান' প্রকল্পে উত্তর-পূর্বের ৬-টি কম ব্যবহৃত এবং ২৪-টি অব্যবহৃত বিমানবন্দর এবং এয়ারস্ট্রিপ পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য দরপত্র চেয়েছে বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। আসামের উমরাঙ্গসো জলাধারের উপর একটি বিমানঘাঁটি তৈরির দরপত্রও চাওয়া হয়েছে। গত ৩ ডিসেম্বর থেকে 'উড়ান' বা আঞ্চলিক বিমান সংযোগ প্রকল্পের অধীনে চতুর্থ দফার দরপত্র ডাকার কাজ শুরু করে কেন্দ্র। এই প্রকল্পে দেশের প্রায় অব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত বিমানবন্দর ও এয়ারস্ট্রিপগুলিকে কাজের উপযুক্ত করে তোলা এবং যাত্রীদের সস্তায় উড়ানের সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিমান পরিবহণ মন্ত্রক উড়ান ৪.০ প্রকল্প শুরু করেছে; এই প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পূর্বের ছ'টি প্রায় অব্যবহৃত এবং ২৪-টি অব্যবহৃত বিমানবন্দর/এয়ারস্ট্রিপ পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে ইচ্ছুক সংস্থাগুলির কাছে দরপত্র চাওয়া হয়েছে। যে বিমানবন্দর/এয়ারস্ট্রিপগুলির পূর্ণ ব্যবহার হয় না সেগুলির তালিকায় অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট ও তাজু, আসামের জোরহাট, রূপসী ও তেজপুর এবং মেঘালয়ের শিলং রয়েছে। এছাড়া, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় ২৪-টি প্রায় অব্যবহৃত বিমানঘাঁটি পড়ে রয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১০০-র বেশি বিমানবন্দর এবং ১,০০০ রুটে উড়ান শুরু করতে চায় কেন্দ্র।

● **আয়কর ফেরত ২৭ শতাংশ বেড়েছে :**

গত ১৩ ডিসেম্বর অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব সচিব অজয়ভূষণ পাণ্ডে জানান, এ বছর এখনও পর্যন্ত আয়কর দপ্তর ১.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা কর ফেরত দিয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ২৭.২ শতাংশ বেশি। সরকারের ঘরে জমা দেওয়া অতিরিক্ত কর ফেরত পেলে করদাতারা ওই অর্থ পণ্য-পরিষেবা কেনায় খরচ করবেন এবং তার ফলে বাজারে ক্রেতা চাহিদা বাড়বে, এমনটাই অনুমান সরকারের। এদিন পাণ্ডে বলেন, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাড়ে আট মাসে আয়কর দপ্তর ১.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা রিফান্ড করেছে। গত বছর ওই পরিমাণ ছিল ১.২৩ লক্ষ কোটি টাকা। শুধু ফেরত দেওয়া করের পরিমাণই নয়, কর ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন আয়করদাতার সংখ্যাও এবছর ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২.১৬ কোটি হয়েছে বলে পাণ্ডে জানান।

● **জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক :**

গত ১৮ ডিসেম্বর জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে লটারির টিকিটে জিএসটি নিয়ে সহমতের ভিত্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জিএসটি কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন তথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ জানান, বিভিন্ন রাজ্যে লটারির উপর সমান হারে জিএসটি আরোপ করা নিয়ে এই প্রথমবার কাউন্সিলের ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। ২০২০ সালের পয়লা মার্চ থেকে সব রাজ্যে লটারির উপর, তা সেটা রাজ্য সরকারে পরিচালিতই হোক বা বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত, ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি বসবে, রাজস্ব সচিব অজয়ভূষণ পাণ্ডে জানান। ব্যবসায়ীদের ২০১৭-'১৮ অর্থবছর থেকে বকেয়া বার্ষিক জিএসটি রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমাও এদিন বাড়িয়ে ২০২০ সালের ৩১ জানুয়ারি করা হয়েছে। ২০১৭ সালে জিএসটি শুরু হওয়ার পর থেকে যে সমস্ত ব্যবসায়ী মাসিক রিটার্ন জমা দেননি তাদের জন্য 'লেট ফি'-ও মকুব করা হয়েছে। তবে, এই রিটার্ন ১০ জানুয়ারির মধ্যে জমা দিতে হবে।

● **ব্যাঙ্ক মূলধন :**

গত ২৬ ডিসেম্বর এলাহাবাদ ব্যাঙ্ককে ২,১৫৩ কোটি টাকা মূলধন দেওয়ায় মঞ্জুরি দেওয়ার পরের দিন ইউকো ব্যাঙ্ককেও ২,১৪২ কোটি টাকা মূলধন দেওয়ার কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। ৩০ আগস্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ৫৫,২৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত মূলধন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। সেই তালিকায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ছিল না। এদিন ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ককেও ৪,৩৬০ কোটি টাকা মূলধন দেওয়ার কথা ঘোষণা করে সরকার। প্রাথমিকভাবে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ককে ৩,৮০০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। বাস্তবে সেটা বাড়িয়ে ৪,৩৬০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

খেলা

➢ বিনেশ ফোগত ও সাক্ষী মালিক নিজেদের ক্যাটাগরিতে সোনা জিতলেন। জাতীয় কুস্তি মিটে। দু'জনেই নেমেছিলেন ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ টিমের হয়ে। অন্যদিকে, ৬৮ কেজি ক্যাটাগরিতে অনিতা সিওরেন হারিয়ে দিয়েছেন কমনওয়েলথ গেমসের ব্রোঞ্জজয়ী দিব্যা করণকে।

- সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে উঠলেন ভারতের সৌরভ ভার্মা। লখনৌতে এই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে সৌরভ ২১-১৭, ১৬-২১, ২১-১৮ হারান দক্ষিণ কোরিয়ার হেয়ো কাওয়াং হিকে। ফাইনালে অবশ্য তিনি হেরে যান চিনা তাইপেই (তাইওয়ান)-এর ওয়্যাং ঝু-য়েই-এর কাছে।
- ভোপালে জাতীয় শুটিংয়ে জুনিয়র বিভাগে ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে রুপো জিতলেন আয়ুশী পোদ্দার। কোয়ালিফায়ারে খুব ভালো ফল না করলেও ফাইনালে দারুণ পারফর্ম করেন। এই ইভেন্টে বাংলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন শেওড়াফুলির আয়ুশীই। জাতীয় শুটিংয়ে এর আগে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে জুনিয়রে সোনা এবং সিনিয়রে রুপো জিতেছেন।
- গ্র্যান্ড চেজ ট্যুরের ফাইনালে ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন চিনের দিং লিরেন। লন্ডনের এই মিটে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন ম্যাক্সিম ভাশিয়ের-ল্যাগ্রেভ। তিন নম্বরে থাকলেন বিশ্বজয়ী ম্যাগনাস কার্লসেন। চার গ্র্যান্ডমাস্টারের এই মিটে চতুর্থ স্থানে আর্মেনিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার লেভন অ্যারোনিয়ান।
- অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের বিশ্বকাপের জন্য আমেদাবাদকে ভেন্যু হিসেবে স্বীকৃতি দিল আয়োজক কমিটি। আমেদাবাদের সেই স্টেডিয়ামের কিছু সংস্কার দরকার। তা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার আশ্বাস দেওয়ার পরই ভেন্যু হিসেবে স্বীকৃতি দিল।

● **সাউথ এশিয়ান গেমস :**

গত ১ থেকে ১০ ডিসেম্বর কাঠমাণ্ডুতে ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমসের আসর বসে। পদক তালিকার শীর্ষে ভারত (সারণি দ্রষ্টব্য)। শেষ সাউথ এশিয়ান গেমস থেকে আরও বেশি পদক পেল ভারত। ২০১৬-তে ৩০৯-টি পদক এসেছিল ভারতের। এবার আরও বেশি। ৩১২-টি পদকের মধ্যে ১৭৪-টি সোনা। রুপো ও ব্রোঞ্জ যথাক্রমে ৯৩ ও ৪৫।

কোনও রান না দিয়ে ৬ উইকেট। মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-২০-তে

সংখ্যা	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১.	ভারত	১৭৪	৯৩	৪৫	৩১২
২.	নেপাল	৫১	৬০	৯৫	২০৬
৩.	শ্রীলঙ্কা	৪০	৮৩	১২৮	২৫১
৪.	পাকিস্তান	৩২	৪১	৫৯	১৩২
৫.	বাংলাদেশ	১৯	৩৩	৯০	১৪২
৬.	মালদ্বীপ	১	০	৪	৫
৭.	ভুটান	০	৭	১৩	২০
	মোট (সাত দেশ)	**৩১৭**	**৩১৭**	**৪৩৪**	**১০৬৮**

এই অবিশ্বাস্য বিশ্বরেকর্ড গড়লেন নেপালের ২৪ বছরের অঞ্জলি চাঁদ। মেয়েদের টি-২০ ক্রিকেটে যা সবচেয়ে সফল বোলিং পারফরম্যান্স (২.১-২-০-৬)। পয়লা ডিসেম্বর সাউথ এশিয়ান গেমসে টি-২০ ম্যাচে নেপালের পোখরায় মালদ্বীপের সঙ্গে ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েন অঞ্জলি। অতীতে কোনও বোলারই শূন্য রানে ৬ উইকেট নেননি। এ বছর জানুয়ারিতে চিনের বিরুদ্ধে ৩ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন মালয়েশিয়ার মাস এলিসার। অঞ্জলির দাপটে এদিন মালদ্বীপ অল আউট হয়ে যায় ১৬ রানে। মাত্র ৫ বলে ১৭-০ স্কোর করে ম্যাচ জিতে যায় নেপাল। তবে এটা রেকর্ড নয়। এর আগে রোয়ান্ডা ও তানজানিয়া দু'টো টিমই মালিকে ৪ বলে হারিয়েছিল।

গত ৬ ডিসেম্বর বাংলার অ্যাথলিট আভা খাটুয়ার সঙ্গে ভারতের হয়ে আরও তিনটি সোনা আনলেন টিটির সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। সিঙ্গলস ফাইনালে তিনি হারান বাংলারই ঐহিকা মুখোপাধ্যায়কে। ছেলেদের সিঙ্গলসের সোনা পেলেন অমলরাজ। ভারত্তোলনে ছেলেদের ৭৩ কেজি বিভাগে ৩০০ কেজি তুলে সোনা পান বাংলার অচিন্ত্য শেউলে। মেয়েদের ৬৪ কেজি বিভাগে ২০০ কেজি তুলে সোনা জিতলেন রাখি হালদার।

তিনটি সোনা জিতলেন বাংলার মেহুলি ঘোষ, কাঠমাণ্ডুতে সাউথ এশিয়ান গেমসে। শুরুতে টিমের হয়ে সোনা জিতেছিলেন। ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছেন বিশ্বরেকর্ড করে। যদিও সেই রেকর্ড নথিবদ্ধ হয়নি। গত ৭ ডিসেম্বর মেহুলি সোনা জিতলেন মিক্সড ইভেন্টে। ভারতীয় শুটার যশ বর্ধনকে জুটি করে। বিশ্ব ক্রম তালিকায় মেহুলি এখন ২৪। এ ইভেন্টের তিনদিন আগে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। আগে স্থান ছিল একশোর নিচে। এক লাফে ২৪-এ ঢুকে পড়লেন মেহুলি।

সাউথ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা। ফাইনালে টানটান উত্তেজনায় শ্রীলঙ্কাকে ২ রানে হারিয়ে পোখরায় সোনা জিতল বাংলাদেশ। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে একশো রানও তুলতে পারেনি বাংলাদেশ। ৮ উইকেটে ওঠে ৯১ রান। লড়াইটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের বোলারদের। শুরু থেকেই চাপ রেখেছিলেন সালমা খাতুন, নাহিদা আখতাররা। প্রথম ছয় ওভারে তিন উইকেটে ১৫ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। জয়ের জন্য শেষ ৩০ বলে দরকার ছিল ২৮ রান। শেষ ওভারে দরকার ছিল সাত রান। শ্রীলঙ্কার হাতে ছিল তিন উইকেট। চাপের মধ্যে বাংলাদেশ পেসার জাহানারা বল করতে আসেন। প্রথম তিন বলে দু' রান আসে। শেষ বলে দরকার ছিল ৩ রান। এই অবস্থায় রান আউট জিতিয়ে দেয় বাংলাদেশকে। সবচেয়ে ভালো বল করেছেন নাহিদা আখতার। ৪ ওভারে ৯ রান দিয়ে দুই উইকেট তুলে নেন তিনি।

বালা দেবীর জোড়া গোলে নেপালকে ২-০ হারিয়ে সাউথ এশিয়ান গেমসে সোনা পেলেন ভারতের মেয়ে ফুটবলাররা। এই গেমসে এই নিয়ে টানা তিনবার সোনা পেল ভারত। নেপালের মাঠে নেপালকে হারানোটা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু গত ৯ ডিসেম্বর পোখরায় সাউথ এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ফুটবল ফাইনালে সেই কাজটা সহজ করে দিলেন ২৯ বছরের মণিপুরী ফুটবলার বালা। ১৮ ও ৫৬ মিনিটে তিনি দু'টি গোল করেন। এই টুর্নামেন্টের তিনিই সর্বোচ্চ স্কোরার ৪ ম্যাচে ৫ গোল করে। বালা যদি ভারতের গোল করার ব্যাপারে সেরা হন, তাহলে গোল বাঁচানোর জন্য সমান কৃতিত্ব পাবেন গোলকিপার অদিতি চৌহান। যিনি টুর্নামেন্টে একটিও গোল খাননি। এদিন ফাইনালে বেশ কয়েকবার অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় গোল বাঁচান অদিতি।

● **অনূর্ধ্ব-২৩ সেরা পশ্চিমবঙ্গ :**

ক্রিকেটে বাংলা টিমের মেয়েরা খেতাব জিতেছিলেন গত বছর। ছেলেদের সাম্প্রতিক সাফল্য বলতে অনূর্ধ্ব-১৯ টিমের কোচবিহার ট্রফি জয়। অধরা মাধুরীর স্বাদ দিল অনূর্ধ্ব-২৩ টিম। গত পয়লা ডিসেম্বর

দেরাদুনে জাতীয় অনূর্ধ্ব ২৩ ওয়ান ডে-তে টুর্নামেন্টের ফাইনালে ৬৪ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলা। বাংলা ২৫৭-৮ (৫০ ওভারে); গুজরাট ১৯৩ (৪৪.১ ওভারে)।

● **মুস্তাক আলি চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটক :**

সুরাতের নাটকীয় ফাইনালে তামিলনাড়ুকে শেষ বলে ১ রানে হারিয়ে ফের সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ চ্যাম্পিয়ন হল কর্ণাটক। শেষ বলে জেতার জন্য তামিলনাড়ুর প্রয়োজন ছিল ৩ রান। কিন্তু এক রানেই আটকে যায় তামিলনাড়ু। আগে ব্যাট করে কর্ণাটক ২০ ওভারে করেছিল ১৮০-৫। জবাবে ২০ ওভারে ১৭৯-৬-এ শেষ তামিলনাড়ু। মণীশ পাণ্ডে শুরুতে টেনেছিলেন কর্ণাটককে। ৪৫ বলে নট আউট ৬০ করে। পালটা ব্যাট করতে প্রবল চাপে পড়ে যায় তামিলনাড়ু। একটা সময় ৮০ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায়। সেখান থেকে দারুণ ঘুরে দাঁড়ায় টিম বাবা অপরাজিত ও বিজয় শঙ্কর। অপরাজিত ৪০ করে ফেরেন। বিজয় ৪৪ করে আউট হন। নাটক জমে ওটে শেষ দু' ওভারে। শেষ ওভারে জেতার জন্য দরকার ছিল ১৩ রান। প্রথম দু' বলে দুটো চারও মেরেছিলেন অশ্বিন। কিন্তু পঞ্চম বলে শঙ্কর রান আউট হতেই সব গল্প শেষ। শেষ বলে দরকার ছিল তিন রান। মুরুগান অশ্বিন এক রানের বেশি নিতে পারেননি।

● **ব্যালন ডি'ওর :**

ব্যালন ডি'ওর। এবছর বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন লিওনেল মেসি। এই নিয়ে মোট ৬ বার এই সম্মান পেলেন মেসি। অন্যদিকে, মহিলাদের বিভাগে বর্ষসেরা হলেন বিশ্বকাপ জয়ী মার্কিন তারকা—সোনার বল, সোনার বুট পাওয়া—মেগান র‍্যাপিনো।

● **বিশ্ব টিটি-তে ভারত এখন ৮ নম্বরে :**

ভারতের ছেলেদের টিটি টিম বিশ্ব ক্রমতালিকায় আট নম্বরে পৌঁছে গেল। অতীতে কোনওদিন প্রথম আটে পৌঁছতে পারেনি ভারত। জি. সাতিয়ান, শরথ কমল ও হরমিত দেশাই, দেশের তিন টিটি তারকা ভারতকে পৌঁছে দিলেন ইতিহাসের পাতায়। বিশ্বের ক্রমতালিকায় সাতিয়ান এখন ৩০ নম্বরে। আর শরৎ ৩৬। সদ্য বিশ্ব মিটে সাতিয়ান প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে ছিলেন। বিশ্বের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের হারিয়ে। সাতিয়ানের আগে বিশ্বের ৩০ নম্বরে পৌঁছতে পারেননি দেশের কেউই। সেখানে সাতিয়ান নজির গড়লেন।

● **বিশ্ব বক্সিংয়ে সাফল্য জোসুয়ার :**

গত ৮ ডিসেম্বর সৌদি আরবের দিরিয়া এরিনায় অ্যান্ডি রুইজনকে রি-ম্যাচে হারিয়ে অ্যান্থনি জোসুয়া বিশ্ব বক্সিংয়ে দু'বারের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হলেন। এর ছ'মাস আগে রুইজ যখন বক্সিং দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন, তখন জোসুয়া হয়তো ভেবেছিলেন দ্বিতীয়বার হারলে তার কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এদিন জোসুয়া ছিলেন নিজের সেরা ফর্মে। মাত্র ৩৬ মিনিটের বাউটে দুর্দান্ত কিছু পাঞ্চিং রিংয়ের মধ্যে তাকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিল বিচারকের সম্মিলিত ফলের সূত্রধরে। যার ফলে জোসুয়া তার আইবিএফ, ডব্লিউবিএ এবং ডব্লিউবিও খেতাব ব্রিটেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। এই জয়ের ফলে তিরিশ বছরের জোসুয়া চলে এলেন কিংবদন্তি মহম্মদ আলি, লেনক্স লুইস, ইভান্ডার হোলিফিল্ড, মাইক টাইসন, ফ্লয়েড প্যাটারসন এবং ভ্লাদিমির ক্লিৎসকোর সঙ্গে একাসনে। বিশ্ব হেভিওয়েট খেতাব ধরে রাখার সৌজন্যে।

● **যুব জাতীয় টিটি-তে বাংলার সোনা :**

যুব জাতীয় টিটিতে ডাবলসে সোনা জিতলেন বাংলার পয়মন্তী বৈশ্য ও সুরভী পাটোয়ারি। যুব বিভাগে তারা ফাইনালে ৩-১-এ হারিয়ে দিলেন সেলিনা সেলভাকুমার ও এন. দীপ্তিকে। জম্মুতে জুনিয়র ও যুব বিভাগের জাতীয় মিটে বাংলার ঘরে একটি সোনাই এল। রুপোও জিতেছেন সুরভী। সিঙ্গলসের ফাইনালে তিনি হেরে গিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের দিয়া পি. চৈতালের কাছে। পয়মন্তী জুনিয়র বালিকা বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ডাবলসে মুনমুন কুণ্ডুকে সঙ্গে নিয়ে। যুব বিভাগে ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতেছে সপ্তপর্ণী দে ও পূজা পাল। যুব বালক বিভাগে আকাশ পাল ও অনিকেত চৌধুরী ব্রোঞ্জ জিতেছেন। সব মিলিয়ে বাংলার ঘরে একটি সোনা, তিনটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ এসেছে।

● **রাশিয়াকে নির্বাসন :**

বিশ্বক্রীড়া থেকে আগামী ৪ বছরের জন্য মুছে যেতে চলেছে রাশিয়ার নাম। তিন রঙা পতাকাটিও আপাতত গুটিয়ে রাখা থাকবে। অলিম্পিক বা বিশ্বকাপে বেজে উঠবে না রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত। কারণ, বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থা (ওয়াডা) গত ৯ ডিসেম্বর সর্বসম্মতভাবে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সুইজারল্যান্ডের লুসানে, তাদের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায়। সব রকম খেলায় বড়ো ইভেন্ট থেকে রাশিয়া নির্বাসিত থাকবে চার বছর। আগামী বছরের টোকিও অলিম্পিকের মতো রাশিয়া থাকবে না ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলেও। প্রধান কারণ রাশিয়ায় সরকারি উদ্যোগে ডোপিং। নকল নথি পেশ। রাশিয়ান ডোপিং বিরোধী সংস্থা (রুসাডা) হাতে ২১ দিন সময় পাচ্ছে এই নির্বাসনের বিরুদ্ধে আবেদন করার জন্য আর যেসব অ্যাথলিটরা নিজেদের ডোপমুক্ত রাখতে পারবেন, তারা বড়ো ইভেন্টে নামতে পারবেন নিরপেক্ষ অ্যাথলিট হিসেবে।

● **পাক আম্পায়ার আলিম দারের বিশ্বরেকর্ড :**

ব্রায়ান লারার ৪০০ নট আউটের সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংসের সাক্ষী তিনি। অস্ট্রেলিয়ার ৪৩৪ তাড়া করে দক্ষিণ আফ্রিকার অবিস্মরণীয় ওয়ান ডে ম্যাচ জয়েরও। সেই আলিম দার নিজেই এখন বিশ্বরেকর্ডের মালিক। অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে টপকে গেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আম্পায়ার স্টিভ বাকনারের সবচেয়ে বেশি ১২৮ টেস্ট ম্যাচ পরিচালনার রেকর্ড। পারথে গত ১২ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয় অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট। দুই দেশের গোলাপি টেস্টের মধ্যে দিয়েই পারথে এই রেকর্ড করলেন ৫১ বছরের পাকিস্তানি আম্পায়ার। তিনি এই নিয়ে ১২৯তম টেস্ট খেলালে। আম্পায়ার হিসেবে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলানো শুধু নয়, ওয়ান ডে ক্রিকেটেও রেকর্ডের মুখে দাঁড়িয়ে আলিম। দক্ষিণ আফ্রিকার রুডি কোয়ের্টজেন সবচেয়ে বেশি ২০৯ ম্যাচ খেলিয়েছেন। দু' ম্যাচ পিছনে দাঁড়িয়ে পাক আম্পায়ার।

ক্রিকেটার হিসেবেই এক সময় পরিচিত ছিল পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে। ১৭-টা প্রথম শ্রেণির ম্যাচও খেলেছেন তিনি। ছিলেন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ও লেগস্পিনার। কিন্তু ক্রিকেটার হিসেবে খুব বেশি দূর এগোতে না পারলেও আম্পায়ারিংকেই পেশা করে নিয়েছিলেন। ২০০০ সালে পাকিস্তানের মাটিতেই প্রথম খেলিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ওই ওয়ান ডে ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। প্রথম টেস্ট খেলিয়েছিলেন ২০০৩ সালে, ঢাকাতে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ম্যাচ ছিল সেটা। ১৯ বছর ধরে এই পাক আম্পায়ারের দারুণ উত্থান হয়েছে সব ফর্ম্যাটেই। ৪৬-টা টি-২০ ম্যাচও খেলিয়েছেন আলিম দার।

● **সেরা তসনিম :**

সাইনা নেহওয়াল, পি. ভি. সিন্ধুদের উত্তরাধিকারী উঠে আসা শুরু। ইন্দোনেশিয়ায় জুনিয়র এশিয়ান ব্যাডমিন্টনের মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের তসনিম মির। ফাইনালে শীর্ষ বাছাই তসমিন ১৭-২১, ২১-১১, ২১-১৯ হারালেন ভারতেরই তারা শাহকে।

● **আইপিএল নিলাম :**

প্রবীণ তাম্বে। গত ১৯ ডিসেম্বর কলকাতায় নিলামে শেষ মুহূর্তে মুম্বইয়ের এই লেগ স্পিনারকে কিনল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৪৮ বছরের তাম্বেই আইপিএল নিলামে বিক্রি হওয়া সবচেয়ে বেশি বয়সি ক্রিকেটার। বেস প্রাইস ২০ লক্ষ টাকায় কেনার জন্য নয়, তাম্বে আলোচনায় আসছেন তার বয়সের জন্য। ২০১৬ সালে শেষবার আইপিএল খেলেছেন গুজরাট লায়ন্সের হয়ে। আইপিএল না খেললেও ক্রিকেটের সঙ্গেই আছেন তাম্বে। মুম্বইয়ের ক্লাব ক্রিকেটে খেলেন ডি. ওয়াই. পাটিলের বি টিমের হয়ে। সম্প্রতি মুম্বই টি-২০ লিগও খেলেছেন। আইপিএল-এর রেকর্ড বইয়ে তার নাম থেকে যাবে চিরকাল। ২০১৪ সালে আমেদাবাদে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে কেকেআর-এর বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের জন্য। সে সময় রাজস্থানের মেন্টর ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তারপর অবশ্য আমেরিকার বেসরকারি টি-২০ লিগ খেলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার সময়ও বিতর্ক হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার সময়ও বিতর্ক হয়েছিল। **আইপিএল-এ কোন টিম কেমন হল : ❖ কলকাতা নাইট রাইডার্স ❍ টিমে এলেন :** প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া), ইওন মর্গ্যান (ইংল্যান্ড), ক্রিস গ্রিন (অস্ট্রেলিয়া), টম ব্যান্টন (ইংল্যান্ড), রাহুল ত্রিপাঠি, বরুণ চক্রবর্তী, মানিমারান সিদ্ধার্থ, নিখিল নায়েক, প্রবীণ তাম্বে। ❍ **থেকে গেলেন :** হ্যারি গার্নে (ইংল্যান্ড), লকি ফার্গুসন (নিউজিল্যান্ড), সুনীল নারিন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), আন্দ্রে রাসেল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), দীনেশ কার্তিক, কুলদীপ যাদব, রিঙ্কু সিং, সিদ্ধেশ লাড, প্রসিধ কৃষ্ণা, শিবম মাভি, কমলেশ নাগারকোটি, সন্দীপ ওয়ারিয়র, নীতিশ রানা, শুবমান গিল। ❖ **চেন্নাই সুপার কিংস ❍ টিমে এলেন :** জোস হ্যাজেলউড (অস্ট্রেলিয়া), স্যাম কারান (ইংল্যান্ড), পীযূষ চাওলা, সাই কিশোর। ❍ **থেকে গেলেন :** ইমরান তাহির (দক্ষিণ আফ্রিকা), মিচেল স্যান্টনার (নিউজিল্যান্ড), লুঙ্গি এনগিডি (দক্ষিণ আফ্রিকা), ডোয়েন ব্র্যাভো (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), শেন ওয়াটসন (অস্ট্রেলিয়া), ফাফ দু প্লেসি (দক্ষিণ আফ্রিকা), মহেন্দ্র সিং ধোনি, হরভজন সিং, রবীন্দ্র জাডেজা, শার্দুল ঠাকুর, কে. এম. আসিফ, দীপক চাহার, করণ শর্মা, মনু কুমার, এন. জগদীশান, কেদার যাদব, মুরলী বিজয়, অম্বাতি রায়াডু। ❖ **রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ❍ টিমে এলেন :** ক্রিস মরিস (দক্ষিণ আফ্রিকা), অ্যারন ফিঞ্চ (অস্ট্রেলিয়া), ডেল স্টেইন (দক্ষিণ আফ্রিকা), কেন রিচার্ডসন (অস্ট্রেলিয়া), জোস ফিলিপ (অস্ট্রেলিয়া), ইসুরু উদানা (শ্রীলঙ্কা), শাহবাজ আহমেদ, প্রবীণ দেশপাণ্ডে। ❍ **থেকে গেলেন :** এবি ডি ভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা), মইন আলি (ইংল্যান্ড), বিরাট কোহলি, নভদীপ সাইনি, ওয়াশিংটন সুন্দর, শিবম দুবে, দেবদূত পাদিক্কাল, গুরকৃত সিং মান, উমেশ যাদব, পবন নেগি, মহম্মদ সিরাজ, পার্থিব প্যাটেল। ❖ **দিল্লি ক্যাপিট্যালস ❍ টিমে এলেন :** সিমরন হেটমেয়ের (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), অ্যালেক্স কেরি (অস্ট্রেলিয়া), ক্রিস ওকস (ইংল্যান্ড), জেসন রয় (ইংল্যান্ড), মার্কাস স্টোইনিস (অস্ট্রেলিয়া), ললিত যাদব, তুষার দেশপাণ্ডে, মোহিত শর্মা। ❍ **থেকে গেলেন :** কিমো পল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কাগিসো রাবাডা (দক্ষিণ আফ্রিকা), সন্দীপ লামিচানে (নেপাল), অজিঙ্ক রাহানে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ইশান্ত শর্মা, ঋষভ পন্থ, শিখর ধাওয়ান, পৃথ্বী শ, শ্রেয়স আয়ার, হর্ষল প্যাটেল, অক্ষর প্যাটেল, আবেশ খান, অমিত মিশ্র। ❖ **মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ❍ টিমে এলেন :** ক্রিস লিন (অস্ট্রেলিয়া), নাথন কুল্টার-নাইল (অস্ট্রেলিয়া), মহসিন খান, সৌরভ তিওয়ারি, দিগ্বিজয় দেশমুখ, প্রিন্স বলবন্ত রায়। ❍ **থেকে গেলেন :** কায়রন পোলার্ড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কুইন্টন ডি কক (দক্ষিণ আফ্রিকা), মিচেল ম্যাকলেনাঘ্যান (নিউজিল্যান্ড), লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলঙ্কা), ট্রেন্ট বোল্ট (নিউজিল্যান্ড), রাদারফোর্ড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), রোহিত শর্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, জশপ্রীত বুমরা, ক্রুনাল পাণ্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, রাহুল চাহার, ঈশান কিশান, অনুকূল রায়, আদিত্য তারে, আনমোলপ্রীত সিং। ❖ **কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ❍ টিমে এলেন :** ক্রিস জর্ডন (ইংল্যান্ড), জেমস নিস্যাম (নিউজিল্যান্ড), শেল্ডন কটরেল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (অস্ট্রেলিয়া), ঈশান পোড়েল, তাজিন্দার সিং, রবি বিসনই, দীপক হুডা, সিমরণ সিং। ❍ **থেকে গেলেন :** ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), হার্ডাস ভিলজোয়েন (দক্ষিণ আফ্রিকা), মুজিব উর রহমান (আফগানিস্তান), নিকোলাস পুরান (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), লোকেশ রাহুল, করুণ নায়ার, মহম্মদ সামি, হরপ্রীত ব্রার, মনদীপ সিং, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, মুরুগান অশ্বিন, সরফরাজ খান, কৃষ্ণাপ্পা গৌতম, জগদীশা সুচিথ। ❖ **রাজস্থান রয়্যালস ❍ টিমে এলেন :** ডেভিড মিলার (দক্ষিণ আফ্রিকা), ওসানে থমাস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), টম কারান (ইংল্যান্ড), অ্যান্ড্রু টাই (অস্ট্রেলিয়া), রবিন উথাপ্পা, জয়দেব উনাদকট, অনুজ রাওয়াত, কার্তিক ত্যাগি, আকাশ সিং, যশস্বী জয়সওয়াল, অনিরুদ্ধ যোশী। ❍ **থেকে গেলেন :** স্টিভ স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া), বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড), জস বাটলার (ইংল্যান্ড), জোফ্রা আর্চার (ইংল্যান্ড), সঞ্জু স্যামসন, রাহুল তেওটিয়া, শ্রেয়স গোপাল, অঙ্কিত রাজপুত, মায়াঙ্ক মার্কাণ্ডে, বরুণ অ্যারন, শশাঙ্ক সিং, রিয়ান পরাগ, মনন ভোরা, মহিপাল লোমরর। ❖ **সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ❍ টিমে এলেন :** মিচেল মার্শ (অস্ট্রেলিয়া), ফ্যাবিয়েন অ্যালেন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), প্রিয়ম গর্গ, সঞ্জয় যাদব, আব্দুল সামাদ, বাভাঙ্কা সন্দীপ, বিরাট সিং। ❍ **থেকে গেলেন :** ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া), কেন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড), জনি বেয়ারস্টো (ইংল্যান্ড), বিলি স্ট্যানলেক (অস্ট্রেলিয়া), মহম্মদ নবি ও রশিদ খান (আফগানিস্তান), ঋদ্ধিমান সাহা, ভুবনেশ্বর কুমার, বিজয় শঙ্কর, নটরাজন, খলিল আমেদ, সিদ্ধার্থ কল, শ্রীবৎস গোস্বামী, শাহবাজ নাদিম, সন্দীপ শর্মা, বাসিল থাম্পি, অভিষেক শর্মা।

❖ **নিলামের সেরা ১০ :** প্যাট কামিন্স, কলকাতা, ১৫.৫০ কোটি টাকা। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, পাঞ্জাব, ১০.৭৫ কোটি টাকা। ক্রিস মরিস, বেঙ্গালুরু, ১০ কোটি টাকা। শেল্ডন কটরেল, পাঞ্জাব, ৮.৫ কোটি টাকা। নাথন কুল্টার-নাইল, মুম্বই, ৮ কোটি টাকা। সিমরণ হেটমেয়ের, দিল্লি, ৭.৭৫ কোটি টাকা। পীযূষ চাওলা, চেন্নাই, ৬.৭৫ কোটি টাকা। স্যাম কারান, চেন্নাই, ৫.৫০ কোটি টাকা। ইওন মর্গ্যান, কলকাতা, ৫.২৫ কোটি টাকা। বরুণ চক্রবর্তী, কলকাতা, ৪ কোটি টাকা।

❖ **সেরা ভারতীয় ১০ :** পীযূষ চাওলা, চেন্নাই, ৬.৭৫ কোটি টাকা। বরুণ চক্রবর্তী, কলকাতা, ৪ কোটি টাকা। রবিন উথাপ্পা, রাজস্থান, ৩ কোটি টাকা। জয়দেব উনাদকাট, রাজস্থান, ৩ কোটি। যশস্বী জয়সোয়াল, রাজস্থান, ২.৪০ কোটি টাকা। রবি বিশনোই, পাঞ্জাব, ২ কোটি টাকা।

প্রিয়ম গর্গ, হায়দরাবাদ, ১.৯০ কোটি। বিরাট সিং, হায়দরাবাদ, ১.৯০ কোটি টাকা। কার্তিক ত্যাগী, রাজস্থান, ১.৩০ কোটি টাকা। অনুজ রাওয়াত, রাজস্থান, ৮০ লক্ষ টাকা।

❖ **যেসব নামী অবিক্রিত :** কার্লোস ব্রাথওয়েট, কলিন মুনরো, বেন কাটিং, মার্টিন গাপ্টিল, এভিন লুইস, শি হোপ, চেতেশ্বর পূজারা, হনুমা বিহারি, ইশ সোধি, অ্যাডাম জাম্পা, টিম সাউদি, অ্যান্ড্রু টাই, ম্যাট হেনরি, মুস্তাফিজুর রহমান, মুশফিকুর রহিম, হেনারিক ক্লাসেন, কলিন ডে গ্র্যান্ডহোম, ইউসুফ পাঠান, স্টুয়ার্ট বিনি, মনোজ তিওয়ারি।

● **চানুর সোনা :**

কাতার আন্তর্জাতিক মিটে সোনা জিতলেন মীরাবাই চানু। ২৫ বছরের এই ভারোত্তোলক ৪৯ কেজিতে সোনা জিতলেন। প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ১৯৪ কেজি তুলে অলিম্পিকের টিকিটের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। টোকিও টিকিটের জন্য ছয় মাসের রেজাল্ট খতিয়ে দেখা হবে। সেই রেজাল্টে একধাপ এগোলেন মণিপুরের ভারোত্তোলক। যদিও এটাই তার সেরা পারফরম্যান্স নয়। ২০১ কেজি তুলেছিলেন অতীতে।

● **বিরাট ও অশ্বিন-কে আইসিসি-র স্বীকৃতি :**

ভারতের স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এই দশকে সবচেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে ঝুলিতে, ৫৬৪। অশ্বিনের পিছনে রয়েছেন জিমি অ্যান্ডরসন (৫৩৫ উইকেট)। তারপর স্টুয়ার্ট ব্রড (৫২৫), টিম সাউদি (৪৭২) ও ট্রেন্ট বোল্ট (৪৫৮)। শুধু অশ্বিন নয়, বিরাট কোহলিকে নিয়েও ট্যুইট করিয়েছে আইসিসি। দশকের শেষে পৌঁছে সেরা পারফরম্যান্স খুঁজতে গিয়ে এই দুই ভারতীয়ের চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সকেই তুলে ধরেছে আইসিসি। এক দশকে যেকোনও ব্যাটসম্যানের চেয়ে ৫৭৭৫ রান বেশি করেছেন বিরাট। সঙ্গে যেকোনও ক্রিকেটারের চেয়ে ২২-টি বেশি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরিও করেছেন বিরাট।

● **বিশ্ব ক্লাব কাপের ট্রফি লিভারপুলের হাতে :**

গত ২২ ডিসেম্বর রাতে দোহার খালিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বিশ্ব ক্লাব কাপের ট্রফি হাতে লিভারপুলের গ্রুপ ছবিতে ছ' ফুট চার ইঞ্চির লম্বা স্টুটগার্টবাসী যুরগেন ক্লপ। একই বছরে জার্মানির ৫২ বছর বয়সি এই কোচ লিভারপুলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা করার পর বিশ্ব সেরা ক্লাবের মর্যাদা এনে দিলেন। বিশ্ব ক্লাব কাপের ফাইনালটা দারুণ উত্তেজকই হল। ব্রাজিলের ফ্লামেঙ্গোকে হারাতে ইউরো সেরাদের ১২০ মিনিট লড়তে হল। নির্ধারিত সময় গোলশূন্য থাকার পর ৯৯ মিনিটে ব্রাজিল টিমের কফিনে পেরেক পোঁতার গোলটি করেন এক ব্রাজিলীয়ই। ৯৯ মিনিটে রবের্তো ফির্মিনোর একমাত্র গোলটিই ম্যাচের ফল গড়ে দেয়। লিভারপুলের ট্রফি ক্যাবিনেটে এই প্রথমবার বিশ্ব ক্লাব কাপ শোভা পাবে। ইপিএল-এর ক্লাব হিসেবে ২০০৮ সালে শেষবার এই ট্রফি পেয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের কোচিংয়ে। চলতি মরশুমে ক্লপের হাত ধরে লিভারপুলের এটা দ্বিতীয় ট্রফি। আগস্টে তারা চেলসিকে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপ জিতেছিল।

● **অজি বোর্ডের বিচারে সেরা ধোনি, বিরাট :**

বিশ্বকাপে ভারতের বিদায়ের পর থেকেই তিনি এক দিনের ক্রিকেটে খেলছেন না। কিন্তু তার পরও বিরাট কোহলিকে হারিয়ে দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া দশকের সেরা যে এক দিনের আন্তর্জাতিক টিম তৈরি করেছে, তাতে অধিনায়ক এবং উইকেটকিপার হিসেবে রাখা হয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। ভারতের বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাও টিমে রয়েছেন। কিন্তু অধিনায়কের মুকুট ধোনিরই। তবে,তাদের বিচারে এই দশকের সেরা টেস্ট টিমের নেতা বাছা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে।

দেশের হয়ে ধোনি ৩৫০-টি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, ৯০-টি টেস্ট এবং ৯৮-টি টি-২০ আন্তর্জাতিক। মোট রান ১৭ হাজার ২৬৬। যার মধ্যে এক দিনের ক্রিকেটে ১০ হাজার ৭৭৩ রান রয়েছে তার। স্টাম্পের পিছনে থেকে ৮২৯-টি আউটের পিছনে রয়েছে ধোনির হাত। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওই রিপোর্ট বলছে, ধোনির গড় ৫০; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ৪৯-টি ইনিংসে অপরাজিত। তার মধ্যে এই দশকে রান তাড়া করতে গিয়ে ২৮ বার অপরাজিত থেকেছে। যার মধ্যে, ভারত হেরেছে মাত্র ৩-টি ম্যাচ। আর স্টাম্পের পিছনে ওর গ্লাভসে ভরসা সব সময়ই পেয়েছে বোলাররা।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দশকের সেরা টিমে তিন ভারতীয় ছাড়া রয়েছেন, হাসিম আমলা, এবি ডেভিলিয়ার্স, সাকিব আল হাসান, জস বাটলার, রশিদ খান, মিচেল স্টার্ক, ট্রেন্ট বোল্ট এবং লাসিথ মালিঙ্গা। একই সঙ্গে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নির্বাচিত এই দশকের সেরা টেস্ট টিমে একই সঙ্গে রয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেট আইকন, বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথ ও কেন উইলিয়ামসন। রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারও। টিমের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। এই টেস্ট টিমে জায়গা পাওয়া ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বাঁ-হাতি লেজেন্ড অ্যালিস্টার কুককে ওপেনিং ব্যাটসম্যান নির্বাচন করা হয়েছে। তার পার্টনার টেস্টে দ্য ৩৩৫ রান করা অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। সাধারণত টিম ইন্ডিয়াতে খেলার সময় তিন কিংবা চার নম্বরে ব্যাট করতে নামে অধিনায়ক বিরাট। কিন্তু ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নির্বাচিত এই দশকের সেরা টেস্ট একাদশে তার পরিবর্তে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক উইলিয়ামসনকে ব্যাট করতে নামার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। চার নম্বরে নামবেন এই মুহূর্তে বিরাটের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্মিথ। বিরাট নামবেন পাঁচে। ছয়ে নামবেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক এবি ডে ভিলিয়ার্স। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নির্বাচিত এই দশকের সেরা টেস্ট একাদশে সাত নম্বরে রাখা হয়েছে ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার বেন স্টোকসকে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ডেল স্টেইন, ইংল্যান্ডের স্টার্ট ব্রড, জেমস অ্যান্ডারসন ও অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার নাথান লিয়ঁও রয়েছেন টিমে।

● **দশকের ধনীতম ক্রীড়াবিদ মেওয়েদার :**

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিওনেল মেসিকে হারিয়ে দিলেন ফ্লয়েড মেওয়েদার। বিশ্বখ্যাত পত্রিকা ফোর্বসের বিচারে এই দশকের সেরা বিত্তশালী ক্রীড়াবিদ হলেন বক্সিংয়ের কিংবদন্তি মেওয়েদার। মেসি এবং রোনাল্ডোকে টোপকে। এই এক দশকে মেওয়েদারের আয়ের পরিমাণ প্রায় ৭০.৬ কোটি ডলার। যেখানে তালিকায় দুই নম্বরে থাকা রোনাল্ডোর আয় প্রায় ৬১.৭১ কোটি ডলারের এবং মেসির উপার্জন প্রায় ৫৭.৮৫ কোটি ডলার। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এই তালিকায় মেওয়েদারই হলেন সবচেয়ে কম খেলা কোনও ক্রীড়াবিদ। গত এক দশকে তিনি মাত্র ১০-টি বাউটে লড়েছেন। যার শেষটি প্রায় দু'বছর আগে হয়েছে এবং ২০১৭ সালে ব্লকবাস্টার এমএমএ সুপারস্টার

কোনর ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে ম্যাচের পরই অবসর নেন আমেরিকান সুপারস্টার। বক্সিংয়ের ইতিহাসে যে ম্যাচ ছিল সবচেয়ে বড়ো অঙ্কের অর্থের। একটি হিসাব বলছে, ওই একটি ম্যাচ থেকে ৩০ কোটি ডলার অর্থ পান মেওয়েদার। তারপর অবসর। ফলে গত দু'বছর তিনি কোনও বাউটে নামেননি। ফোর্বসের তালিকা এক নজরে : (১) মেওয়েদার ৭০.৬ কোটি ডলার; (২) রোনাল্ডো ৬১.৭১ কোটি ডলার; (৩) মেসি ৫৭.৮৫ কোটি ডলার; (৪) লেব্রন জেমস ৫২.৪৫ কোটি ডলার; (৫) ফেডেরার ৪৯.৩৭ কোটি ডলার; (৬) টাইগার উডস ৪৭.৪৪ কোটি ডলার; (৭) ফিল ম্যাকিলসন ৩৭.২৫ কোটি ডলার; (৮) ম্যানি পাকিয়াও ৩৩.৫৫ কোটি ডলার; (৯) ডুরান্ট ৩২.৭৫ কোটি ডলার; (১০) হ্যামিল্টন ৩০.৮৫ কোটি ডলার।

● **উইজডেনের দশক সেরা :**

উইজডেনের বিচারে এক দশকের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের তালিকায় সবার উপরে বিরাট কোহলি। তার পরে দুটো স্থান ভাগাভাগি করে নিয়েছেন দুই দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা। ডেল স্টেইন ও এবি ডে ভিলিয়ার্স। চার নম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। গত এক দশক ধরেই যিনি বিরাটের এক নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। উইজডেন পাঁচ নম্বরে যাকে রেখেছে, তিনিও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার। মেয়ে ক্রিকেটার এলিস পেরি। যিনি রয়েছেন দশক সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় পাঁচ নম্বরে।

পরিসংখ্যান বলছে, গত দশ বছরে বিরাট বিশ্বের অন্য ক্রিকেটারের চেয়ে ৫,৭৭৫ রান বেশি করেছেন। উইজডেন যে টেস্ট টিম করেছে, তার অধিনায়কও বিরাট কোহলি। এক দশকে বিরাট টেস্টে ৭,২০২ রান করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে ২৭ সেঞ্চুরি। ওয়ান ডে-তে বিরাটের রান ১১,১২৫-টি। টি-২০-তে ২,৬৩৩। সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে কোহলির আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির সংখ্যা ৭০। সেঞ্চুরির নিরিখে তার সামনে রিকি পন্টিং (৭১) এবং শচীন তেণ্ডুলকর (১০০)। সবচেয়ে বেশি রানের তালিকাতেও কোহলি তিন নম্বরে (২১,৪৪৪)। সামনে সেই পন্টিং (২৭,৪৮৩) এবং শচীন (৩৪,৩৫৭)।

উইজডেন আরও একটি বড়ো সম্মান দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটকে। এই দশকের সেরা আইপিএল টিম বানিয়েছে উইজডেন। যার নেতৃত্বে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হিসেবে সফল রোহিত শর্মা। সেই টিমে আছেন ধোনি-বিরাট। উইজডেনের বিচারে এই দশকের সেরা আইপিএল একাদশে রয়েছেন সাতজন ভারতীয় ক্রিকেটার। পুরো টিম এরকম : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), ক্রিস গেইল, সুরেশ রায়না, বিরাট কোহলি, এবি ডে ভিলিয়ার্স, এমএস ধোনি, রবীন্দ্র জাডেজা, সুনীল নারিন, লাসিথ মালিঙ্গা, ভুবনেশ্বর কুমার, জশপ্রীত বুমরা।

● **নাইটহুড পেলেন ক্লাইভ লয়েড :**

নাইটহুড পেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ক্রিকেটার (বর্তমানে লন্ডনের বাসিন্দা) ক্লাইভ লয়েড। ৭৫ বছরের গায়ানা-জাত ব্যাটসম্যান ক্রিকেটে তার সারা জীবনের স্বীকৃতির জন্য এই উপাধি পেলেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত লয়েড ক্যাপ্টেন ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের। পরে তিনি গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার এরিয়াতে থাকা শুরু করেন। অবসরের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ হয়েছিলেন। পরে, আইসিসি-র সঙ্গেও যুক্ত হন। বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানের ২২ বছর বয়সে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। দেশের জার্সিতে টেস্টে ১১০-টি ইনিংসে তার ৭ হাজার ৫১৫ রান রয়েছে। গড় ৪৬।

১৯৮৪ সালে লয়েডের নেতৃত্বে টানা ২৬ ম্যাচে জয় পেয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডকে ৫-০ হারিয়েছিল। সেটা 'ব্ল্যাকওয়াশ' সিরিজ নামে পরিচিত। তার সৌজন্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ জেতে। ১৯৭৫ সালে এবং এখনও লর্ডসে তার ১০২ রানের ইনিংস স্মরণীয় হয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ডেনিস লিলি এবং জেফ টমসনের আগুনে বোলিংয়ের বিরুদ্ধে। সাতের দশকে ল্যাঙ্কাশায়ারে লয়েড লোকগাথায় ঢুকে গিয়েছিলেন তার পারফরম্যান্সের সৌজন্যে। তাকে সে সময় বলা হ'ত, 'এক দিনের ক্রিকেটের সম্রাট'।

ইংল্যান্ডকে এ বছর বিশ্বকাপ দেওয়া বেন স্টোকস এবং ইংল্যান্ডের কোচ ট্রেভর বেলিস পাচ্ছেন 'অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' পুরস্কার এবং অধিনায়ক ইওন মর্গ্যান এবং ইসিবি চেয়ারম্যান পাচ্ছেন সিবিইএস পুরস্কার। সেই সঙ্গে, উইকেট কিপার জস বাটলার, জো রুট পাচ্ছেন মেম্বার অব মোস্ট এক্সেলেন্ট অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার পুরস্কার। একই পুরস্কার পাচ্ছেন ইংল্যান্ডের মেয়ে ফুটবলার জিল স্কট।

● **নয়া নজির গড়লেন বিশ্বজয়ী কোনেরু হাম্পি :**

কোনেরু হাম্পি। মস্কোয় তারই সৌজন্যে উড়ল ভারতের বিজয় পতাকা। আর্মাগেডনের লেই তিঙ্গজিকে প্লে-অফে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন হাম্পি। ছেলেদের র‍্যাপিডে অবশ্য নতুন কোনও চমক নেই। চ্যাম্পিয়ন সেই ম্যাগনাস কার্লসেন। এইভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া তার কাছে বাড়িতে কৃতিত্বের কারণ, মা হওয়ার কারণে ২০১৬ থেকে ২০১৮, এই দুই বছর দাবা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। ফেরার এক বছর মধ্যেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে সবাইকে চমকে দিলেন। ২৬ ডিসেম্বর মস্কোয় শুরু হয়েছিল তিন দিনের এই মিট। মা হওয়ার পর কোর্টে ফিরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এমন নজির বিশ্বক্রীড়া দুনিয়ায় রয়েছে। টেনিসে যেমন মার্গারেট কোর্ট, কিম ক্লিস্টার্ন, ইভন গুলাগং। এখনও লড়ে যাচ্ছেন সেরেনা উইলিয়ামস। জামাইকার ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলিট শেলি অ্যান ফ্রেজার প্রাইসও মা হওয়ার পর ফিরে এসে বিশ্বমিটে ১০০ মিটার এবং ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেসে সোনা জিতেছেন। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন ভারতের কোনেরু হাম্পি।

● **আইসিসি-র টেস্ট ক্রমপর্যায় :**

বছরের শেষটা আইসিসি-র টেস্ট ক্রমপর্যায়ের একে থেকে শেষ করলেন বিরাট কোহলি। কিন্তু টেস্ট স্পেশালিস্ট চেতেশ্বর পূজারা চার থেকে নেমে গেলেন পাঁচে। টেস্ট ক্রমপর্যায়ের দুইয়ে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। তার পয়েন্ট ৯১১। স্মিথের থেকে ১৭ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছেন বিরাট। ভারতীয় ক্যাপ্টেনের পয়েন্ট ৯২৮। তিনে নিউজিল্যান্ডের ক্যাপ্টেন কেন উইলিয়ামসন (৮২২)। চারে উঠে এলেন মার্নাস লাবুসেন। চলতি বছরটাতে অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছেন লাবুসেন। ১১ টেস্টে ১,০৮৫ রান করেছেন সব মিলিয়ে। ৭৯১ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে পূজারা। বোলারদের তালিকায় ছয়েই থেকে গেলেন জশপ্রীত বুমরা। চোটের জন্য মাস দুয়েক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না থাকলেও খুব একটা নেমে যাননি তিনি। তার পয়েন্ট ৭৯৪। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও বাংলার পেসার মহম্মদ সামি রয়েছেন নবম ও দশম স্থানে। বোলারদের তালিকায় শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স, দুই ও তিনে নিল ওয়াগকনার ও কাগিসো রাবাডা।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

- দেশের অন্যতম দূষিত নদী হিসেবে চিহ্নিত বিদ্যাধরীর দূষণ ঠেকাতে গত বছরই নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। আদালতের নির্দেশ মেনে বিদ্যাধরী পুনরুজ্জীবনে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্যের নদী পুনরুজ্জীবন কমিটি। প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী দেড় থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে এই প্রকল্প। খরচ হবে আনুমানিক সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা।
- পরিবেশ রক্ষায় তার লড়াই, 'ফ্রাইডেজ ফর ফিউচার' প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। সুইডেনের সেই কিশোরী পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে 'পার্সন অব দ্য ইয়ার, ২০১৯' মনোনীত করল টাইম ম্যাগাজিন।
- রেলওয়ে উৎপাদন ইউনিট সেক্টরে ব্যুরো অব এনার্জি এফিসিয়েন্সিতে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (সিএলডব্লিউ)। সম্প্রতি দিল্লিতে সিএলডব্লিউ-কে জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ পুরস্কার দেওয়া হয়।

● **বায়ুদূষণ নিয়ে সমীক্ষা :**

বড়ো রাস্তায় যানবাহনের প্রবল বায়ুদূষণ আপনার বাচ্চার ফুসফুসের বৃদ্ধি ১৪ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে! ব্রিটেন এবং পোল্যান্ডের ১৩-টি শহরের উপর একটি সমীক্ষা এমন আশঙ্কার কথাই শোনাচ্ছে। সমীক্ষায় দাবি, প্রধান সড়কের ৫০ মিটারের মধ্যে বসবাস ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্ভাবনা ১০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। বায়ুদূষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে হার্টের অসুখ, স্ট্রোক, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের সম্ভাবনা। অক্সফোর্ডে ব্যস্ত রাস্তায় বায়ুদূষণ বাচ্চাদের ফুসফুসের বৃদ্ধি প্রায় ১৪ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে, লন্ডনের ক্ষেত্রে সেটি ১৩ শতাংশ, বার্মিংহামে ৮ শতাংশ, লিভারপুলে ৫ শতাংশ, নটিংহামে ৩ শতাংশ এবং সাউথাম্পটনে ৪ শতাংশ। 'কিংস কলেজ লন্ডন'-এর গবেষকদের দাবি, ব্রিটেনে বায়ুদূষণ এক-পঞ্চমাংশ কমাতে পারলে বাচ্চাদের ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা কয়েক হাজার কমে যাবে!

● **দূষণের কবলে রাজ্যের ১৭-টি নদী :**

উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে দূষিত নদী মহানন্দায় শিলিগুড়ি শহরের নিকাশি নালার জল ফেলা বন্ধ করতে উদ্যোগী হল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। রাজ্যের যে ১৭-টি নদীকে পর্ষদ দূষিত বলে চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যাধরী এবং উত্তরবঙ্গের মহানন্দা নদী চিহ্নিত। মহানন্দা এতটাই দূষিত যে স্নানেরও অযোগ্য বলে মনে করছেন পর্ষদের আধিকারিকেরা। প্রতি ১০০ মিলিলিটারে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া ৫০০-র কম থাকলে তা স্নানের যোগ্য বলে মনে করেন তারা। সেখানে মহানন্দায় প্রতি ১০০ মিলিলিটারে কলিফর্ম মিলেছে দুই লক্ষাধিক। শহরের ৯৪-টি নিকাশি নালার জল প্রতিদিন মহানন্দায় মিশছে। নদীর দু'পাশে গোরু ও মোষের খাটাল, শুয়োরের ফার্মের বর্জ্যও মিশছে। শহরের বস্তির আবর্জনাও ফেলা হয় মহানন্দাতে। পর্ষদের বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যায়, এই সমস্ত কারণেই মহানন্দার জলপান তো দূরের কথা, স্নানেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পর্ষদের পরিকল্পনা হল, নদীর দু'পাশ দিয়ে দু'টি নালা তৈরি করে সমস্ত নিকাশি নালার জল নদীতে পড়ার আগেই শহরের বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলা। তার পর সেই জল পরিশোধন করে সেচ অথবা অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করানোর ব্যবস্থা করা। সম্প্রতি দীঘাতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত শিল্প সম্মেলনে পর্ষদের কর্তারা একটি জার্মান সংস্থার সঙ্গে এই ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। অন্যান্য সংস্থারও সঙ্গেও কথা বলবেন তারা। আগামী বছরের মাঝামাঝি নাগাদ মহানন্দা নদীকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে মাঠে নামবে পর্ষদ। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার মহানন্দা নদীকে বাঁচানোর জন্য ৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।

● **পরিবেশ রক্ষায় দেশে ফের সেরা বাংলা :**

পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান পেল পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় সরকার যে 'সুশাসন সূচক' (গুড গভর্ন্যান্স ইনডেক্স বা জিজিআই) প্রকাশ করেছে, তাতে পরিবেশ রক্ষায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগগুলি আরও একবার জাতীয় স্বীকৃতি পেল। এর আগে রাজ্যের সবুজ সাথী প্রকল্পও দেশে এবং আন্তর্জাতিক মহলে বন্দিত হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে উন্নত শৌচালয় নির্মাণ। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা কুড়িয়েছে এই কাজে রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা প্রকল্প। আর কলকাতার পরিবেশ রক্ষায় অভিনব উদ্যোগ গ্রহণের জন্য হালে কোপেনহেগনে আয়োজিত মেয়র সম্মেলনে বিশেষ সম্মান জানানো হয় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। সম্প্রতি কলকাতা, হাওড়া এবং বিধাননগরে ফুটপাথের খাবার বিক্রেতা, ছোটো লন্ড্রিকে নিঃখরচায় রান্নার গ্যাস ওভেন, হিটার দেওয়া শুরু হয়েছে। কয়লা, কাঠ পোড়ানো আটকাতেই এই সিদ্ধান্ত। সবুজায়নের লক্ষ্যে 'বেঙ্গল গ্রিন মিশন' নামে একটি প্রকল্পও হাতে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

● **সর্বভারতীয় বনসৃজনের দ্বিবার্ষিক রিপোর্ট :**

সর্বভারতীয় বনসৃজনের দ্বিবার্ষিক রিপোর্টে ইতিবাচক নম্বরই পেল বাংলা। গত ৩০ ডিসেম্বর নয়া দিল্লিতে প্রকাশিত ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সমীক্ষা বলছে, গত দু'বছরের রাজ্যে বনাঞ্চল বেড়েছে প্রায় ৫৫ বর্গকিলোমিটার। তবে একই সঙ্গে আশঙ্কা, এই দু'বছরে রাজ্যের প্রায় ২ বর্গকিলোমিটার ম্যানগ্রোভ এলাকা কমেছে। ২০১৭-র সমীক্ষা জানিয়েছিল, ২০১৫-র তুলনায় রাজ্যের ম্যানগ্রোভ অরণ্য প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার বেড়েছিল। ২০১৩-'১৫ সালেও ম্যানগ্রোভ বেড়েছিল বাংলায়। দেশের নিরিখে বর্তমান সমীক্ষায় ম্যানগ্রোভ বৃদ্ধিতে এক নম্বরে গুজরাট। সেখানে ম্যানগ্রোভ বেড়েছে ৩৭ বর্গকিলোমিটার। তার পরেই মহারাষ্ট্র, যেখানে ১৬ বর্গকিলোমিটার ম্যানগ্রোভ এলাকা বেড়েছে। সার্বিকভাবেও বনসৃজনে ভারত এগোচ্ছে, জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

'ইন্ডিয়া স্টেট অব ফরেস্ট রিপোর্ট, ২০১৯' জানাচ্ছে, বিপুল জনসংখ্যার চাপ সত্ত্বেও ২০১৪ সালের পরে দেশে মোট বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩,০০০ বর্গকিলোমিটারের বেশি। এদিকে গত দু'বছরে দেশে গড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য বেড়েছে ৫৪ বর্গকিলোমিটার, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ও তার সংলগ্ন জনপদ রক্ষায় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষা বলছে, ম্যানগ্রোভ মূলত কমছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায়। অথচ এই জেলাই দেশের মোট ম্যানগ্রোভ অরণ্যের (৪,৯৭৫ বর্গকিলোমিটার) প্রায় ৪২ শতাংশ সংরক্ষণ করে। এই জেলায় গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার ম্যানগ্রোভ বা বাদাবন ধ্বংস করে বেআইনি নির্মাণ ও ভেড়ি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। সঙ্গে ফণী, বুলবুলের মতো মারণ ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কা। যদিও সুন্দরবনের এই বাদাবনই বুলবুলের সময় বিস্তীর্ণ এলাকাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

প্রয়াণ

● **বব উইলিস :**

রান আপে দৌড়তেন যখন, তার অদ্ভুত ছন্দ গ্যালারিকে সম্মোহিত করত। একইভাবে যখন মাইক ধরতেন, তার কণ্ঠসম্পদ এবং বিশ্লেষণ অন্যরকম ভাবাত। ১৯৮১ সালে হেডিংলেতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তার ৪৩ রানে ৮ উইকেট এক মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটে। যা 'মিরাকল অব হেডিংলে' বলা হয়। সেই বব উইলিস (৭০) আর নেই। বেশ কিছু দিন হল ভুগছিলেন থাইরয়েড ক্যান্সারে। মারা গেলেন গত ৪ ডিসেম্বর। উইলিসের জন্ম হয়েছিল স্যান্ডারল্যান্ডে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪-র মধ্যে ৯০ টেস্ট খেলেছেন। উইকেটের সংখ্যা ৩২৫। যখন অবসর নেন, তখন উইলিসের তুলনায় সবচেয়ে বেশি টেস্ট উইকেট ছিল শুধু ডেনিস লিলির। এই তথ্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে, কেমন ভয়ংকর বোলার ছিলেন উইলিস। ১৯৭৫ সালে তার দুই হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়। তার পরেও তিনি ন'বছর খেলেছিলেন। গড় ২৫.২০। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ১৮ টেস্ট ও ২৯-টি ওয়ান ডে ম্যাচে ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন্সিও করেছেন।

২১ বছর বয়সে অ্যাসেজে তার অভিষেক। ডাক পেয়েছিলেন আহত অ্যালান ওয়ার্ডের জায়গায়। শেষ চারটে সিরিজে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি দীর্ঘ দিন খেলার জন্য এসেছেন। ইংল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে উইলিসের চেয়ে বেশি উইকেট আছে মাত্র তিন জনের, জেমস অ্যান্ডরসন (৫৭৫), স্টুয়ার্ট ব্রড (৪৭১) এবং ইয়ান বোথাম (৩৮৩)। যতদিন ক্রিকেট থাকবে, হেডিংলেতে উইলিসের ৮-৪৩ থেকে যাবে। সেবারের অ্যাসেজে ০-১ পিছিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। উইলিসের অবিস্মরণীয় পেস বোলিং ১৮ রানে জিতিয়েছিল ইংল্যান্ডকে। পুরো সিরিজে সব মিলিয়ে ২৯-টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। অ্যালান বর্ডার-সহ পুরো অস্ট্রেলিয়া টিম সারা সিরিজ জুড়ে বিব্রত ছিলেন উইলিসকে নিয়ে।

● **বেসিল বুচার :**

গত ১৬ ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের নামী প্রাক্তন ব্যাটসম্যান বেসিল বুচার প্রয়াত হলেন। বয়স হয়েছিল ৮৩। দীর্ঘ দিন ধরে ফ্লোরিডায় অসুস্থ ছিলেন তিনি। ১৯৫৮-১৯৬৯ সালের মধ্যে খেলেছিলেন ৪৪-টি টেস্ট, সাতটি সেঞ্চুরি-সহ করেন ৩,১০৪ রান, গড় ৪৩.১১। ১৯৭০ সালে উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন।

● **শ্রীরাম লাগু :**

বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রীরাম লাগু চলে গেলেন। হিন্দি ও মারাঠি ছবির এক পরিচিত নাম শ্রীরাম লাগু বয়সজনিত অসুস্থতার জন্য ক'দিন ধরে পুণের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। প্রয়াত হলেন গত ১৭ ডিসেম্বর রাতে। রেখে গেলেন স্ত্রী দীপাকে। পঁচিশ বছর আগে এক রেল দুর্ঘটনায় তার একমাত্র পুত্র তনভীরের মৃত্যু হয়। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ঘরাওন্দা, কিতাব, মুকদ্দর কা সিকন্দর, সৌতন, লাওয়ারিস, দো অওর দো পাঁচ, গেহরাই, মীরা, কস্তুরী, গান্ধী, অনকহি, সয়ম্বর এবং একদিন অচানক। আটের দশকে দূরদর্শনের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'খানদান'-এ তিনি ছিলেন এক বিশেষ ভূমিকায়। প্রায় দু'শোর কাছাকাছি ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। মারাঠি মঞ্চে তিনি ছিলেন নটসম্রাট। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে আছে 'নটসম্রাট', 'গিধড়ে' এবং 'আত্মকথা'। শ্রীরাম লাগুর জন্ম মহারাষ্ট্রের সাতারায় ১৯২৭ সালের ১৬ নভেম্বর। পুণের মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি প্রথমে এমবিবিএস এবং পরে এমএস করেন। ইএনটি সার্জেন হিসাবেই তার পরিচিতি ছিল। কলেজ জীবনেই মঞ্চাভিনেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও তার সিনেমায় আসা বেশ দেরিতেই। ১৯৭২ সালে ভি. শান্তারামের মারাঠি ছবি 'পিঞ্জরা'-তে। এর পর প্রায় চার দশক চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তিনি দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বাণিজ্যিক ও সমান্তরাল ছবিতে।

● **রোনাল্ড মাথেস :**

গত ২০ ডিসেম্বর মারা গেলেন জার্মানির কিংবদন্তি সাঁতারু রোনাল্ড মাথেস (৬৯)। ব্যাক স্ট্রোকে তিনি পূর্ব জার্মানির হয়ে অলিম্পিকে চারটি সোনা জিতেছিলেন। তার সময়ে তিনি ছিলেন বিশ্বের সেরা ব্যাক স্ট্রোক সাঁতারু। ব্যক্তিগত ইভেন্ট ছাড়া রিলেতেও দু'বার সোনা জিতেছেন তিনি।

বিবিধ

➢ বর্ষীয়ান অভিনেতা দিলীপ কুমার সম্মানিত হলেন লন্ডনের 'দ্য ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস'-এর তরফ থেকে। তবে দিলীপ কুমার নিজে এই পুরস্কার ও সার্টিফিকেট নিতে পারেননি। তার তরফ থেকে স্ত্রী সায়রা বানু, ভাই আসলাম খান আর দুই বোন সাইদা এবং ফরিদা খান এই পুরস্কার নেন। ৯৭ বছর বয়সি দিলীপ কুমার বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। যার মধ্যে অন্যতম দাদাসাহেব ফালকে আর পদ্মবিভূষণ।

● **মিস ইউনিভার্স জোজিবিনি টুনজি :**

গত ৮ ডিসেম্বর আটলান্টার মঞ্চে মিস ইউনিভার্স ২০১৯-এর মুকুট দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গী সুন্দরী জোজিবিনি টুনজির মাথাতে উঠল। মেয়েদের নেতৃত্বে আনতে চেয়ে বিশ্বজয়ী। দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রাম সিদওয়াদওয়েনিতে বড়ো হয়েও একের পর এক প্রতিকূলতা পেরিয়েছেন। মডেলিংয়ের পাশাপাশি চলেছে লেখাপড়া। গত বছর কেপ পেনিনসুলা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক স্তরের লেখাপড়া শেষ করেছেন। তবে ২০১৭ সালে মিস সাউথ আফ্রিকা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নাম দিলেও সেরা ২৬-এ পৌঁছতে পারেননি। থামেননি জোজিবিনি। ২০১৯-এ যোগ দেন ফের। সেখানে জয়ের পর বিশ্ব মঞ্চেও সেরার শিরোপা।

● **মালালা ইউসুফজাই-কে রাষ্ট্রপুঞ্জের মর্যাদা :**

তালিবানি রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মালালা ইউসুফজাই-কে এই দশকের সব থেকে বিখ্যাত তরুণীর মর্যাদা দিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। সংগঠনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, খুব কম বয়স থেকেই নারী শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করে আসছেন তিনি; তালিবানি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তালিবানি ফতোয়া উপেক্ষা করে স্কুলে যাওয়ার 'অপরাধে' কিশোরী মালালাকে গুলি করেছিল জঙ্গিরা। একাধিক অস্ত্রোপচারের পর প্রাণে বেঁচেছিলেন তিনি। সেই হামলা তাকে আরও শক্তি জুগিয়েছে নারী শিক্ষার হয়ে লড়াই করার জন্য। সবচেয়ে কম বয়সি নোবেল পুরস্কার প্রাপক তিনি। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ শান্তির দূত হিসেবে নিয়োগ করে তাকে।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

জানেন কি?

ভারতে ব্যাঘ্র করিডোর

ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংস্থা'-র সঙ্গে যৌথভাবে 'জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' "Connecting Tiger Populations for Long-term Conservation" শীর্ষক একটি নথি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছে। সংশ্লিষ্ট নথিটিতে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ৩২-টি মুখ্য ব্যাঘ্র করিডোরের বিশদ মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। বন্যপ্রাণ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৩৮ভি অনুযায়ী, বাধ্যতামূলক হিসাবে চিহ্নিত এক "ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প"-এর মাধ্যমে করিডোরগুলির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ পরিচালনা করা হবে। এই করিডোরসমূহের তালিকা এখানে পেশ করা হল :

বিস্তারভূমি	করিডোর	রাজ্য/দেশ
শিবালিক পর্বত ও গাঙ্গেয় সমভূমি	(১) রাজাজী-করবেট	উত্তরাখণ্ড
	(২) করবেট-দুধওয়া	উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ
	(৩) দুধওয়া-কিষাণপুর-কাতেরনিয়াঘাট	উত্তরপ্রদেশ, নেপাল
মধ্য ভারত ও পূর্বঘাট	(১) রণথম্বোর-কুনো-মাধব	মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান
	(২) বান্ধবগড়-আচানকমার	মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়
	(৩) বান্ধবগড়-সঞ্জয় ডুবরি-গুরু ঘাসিদাস	মধ্যপ্রদেশ
	(৪) গুরু ঘাসিদাস-পালামৌ-লাভালং	ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড
	(৫) কান্‌হা-আচানকমার	মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়
	(৬) কান্‌হা-পেঞ্চ	মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র
	(৭) পেঞ্চ-সাতপুরা-মেলঘাট	মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র
	(৮) কান্‌হা-নভেগাঁও নাগজিরা-তোডোবা-ইন্দ্রাবতী	মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ
	(৯) ইন্দ্রাবতী-উদান্তি সীতানদী-সুনাবেদা	ছত্তিশগড়, ওড়িশা
	(১০) সিমলিপাল-সাতকোশিয়া	ওড়িশা
	(১১) নাগার্জুনসাগর-শ্রীভেঙ্কটেশ্বর জাতীয় উদ্যান	অন্ধ্রপ্রদেশ
পশ্চিমঘাট	(১) সহ্যাদ্রি-রাধানগরী-গোয়া	মহারাষ্ট্র, গোয়া
	(২) ডাণ্ডেলি আঁশি-শ্রাভাথি উপত্যকা	কর্ণাটক
	(৩) কুদ্রেমুখ-ভদ্রা	কর্ণাটক
	(৪) নগরাহোলে-পুষ্পগিরি-তালকাবেরী	কর্ণাটক
	(৫) নগরাহোলে-বাঁদিপুর-মুদুমালাই-ওয়েনাড	কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু
	(৬) নগরাহোলে-মুদুমালাই-ওয়েনাড	কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু
	(৭) পরম্বিকুমাল-এর্নাকুলাম-ইন্দিরা গান্ধী	কেরালা, তামিলনাড়ু
	(৮) কালাকাদ মুণ্ডনথুরাই-পেরিয়ার	কেরালা, তামিলনাড়ু
উত্তর-পূর্ব	(১) কাজিরাঙ্গা-ইটানগর অভয়ারণ্য	অসম, অরুণাচলপ্রদেশ
	(২) কাজিরাঙ্গা-কার্বি আংলং	অসম
	(৩) কাজিরাঙ্গা-নামেরি	অসম
	(৪) কাজিরাঙ্গা-ওরাং	অসম
	(৫) কাজিরাঙ্গা-পাপুম পানে	অসম
	(৬) মানস-বক্সা	অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ভুটান
	(৭) পাক্কে-নামেরি-সোনাই রূপাই-মানস	অরুণাচলপ্রদেশ, অসম
	(৮) ডিব্রু শইখোয়া-ডি'ইরিং-মেহাওং	অসম, অরুণাচলপ্রদেশ
	(৯) কামলং-কেন-টেল ভ্যালি	অরুণাচলপ্রদেশ
	(১০) বক্সা-জলদাপাড়া	পশ্চিমবঙ্গ

এছাড়াও, প্রকৃতিবিরুদ্ধ নিয়মে মনুষ্য বসতিতে বাঘের আগমন ও বাঘের বিচরণভূমিতে মানুষের আনাগোনা এড়াতে এক ত্রিমুখী রণকৌশল ছকা হয়েছে।

(১) সহায়সম্পদ দিয়ে সহায়তা : কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত চালু ব্যাঘ্র প্রকল্পের মাধ্যমে তহবিল সহায়তা প্রদান। বাঘেরা যাতে তাদের স্বাভাবিক আবাসভূমি থেকে বেরিয়ে প্রকৃতি-বিরুদ্ধভাবে ইতস্তত বিচরণ না করে, তার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপত্র করতে পরিকাঠামো ও সহায়সম্পদের দিক থেকে সক্ষমতা অর্জনের জন্য 'টাইগার রিজার্ভ'-গুলিকে দেওয়া হবে এই তহবিল সহায়তা। টাইগার রিজার্ভসমূহ এর জন্য আর্জি জানাবে প্রতি বছর একটি বার্ষিক কর্মকাণ্ড পরিচালন পরিকল্পনা (Annual Plan of Operation বা APO) পেশ করে। বন্যপ্রাণ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৩৮ভি-তে বাধ্যতামূলক হিসাবে উল্লেখিত এক সার্বিক ব্যাঘ্র সংরক্ষণ পরিকল্পনা (Tiger Conservation Plan বা TCP)-র অংশ হিসাবে এই AOP প্রস্তুত করবে টাইগার রিজার্ভসমূহ। অন্যান্য বিভিন্ন কাজে লাগানোর পাশাপাশি এই তহবিল ব্যয় করা হবে নিয়মিত প্রদেয় অর্থ তথা ক্ষতিপূরণ প্রদান বাবদ; সময় সময় জনসচেতনতা প্রচারাভিযান চালাতে; দৈবাৎ বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি পড়ে গেলে কী করণীয় সে সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পরামর্শদান ও গাইড করা খাতে; বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম মারফৎ তথ্য সম্প্রচারের ব্যবস্থা খাতে; বিভিন্ন ধরনের সাজসরঞ্জাম, ওষুধপত্র কেনা খাতে; সাধারণ বন্যপ্রাণ

(শেষাংশ তৃতীয় প্রচ্ছদে)

ও স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে যেসব সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে তার মোকাবিলায় বনকর্মীদের দড় করে তুলতে প্রশিক্ষণদান ও স্বশক্তিকরণ খাতে।

(২) বাঘের স্বাভাবিক আবাসস্থলে হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ

টাইগার রিজার্ভ-এর ধারণ ক্ষমতা, অর্থাৎ, সুষ্ঠুভাবে কতসংখ্যক বাঘ সেই জঙ্গলে বিচরণ করতে পারবে, তার উপর ভিত্তি করে এক সার্বিক ব্যাঘ্র সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাঘের স্বাভাবিক আবাসস্থলে হস্তক্ষেপের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। যদি বাঘের সংখ্যা উল্লিখিত ধারণ ক্ষমতা স্তরে থাকে, তাহলে সেই ব্যাঘ্র বিচরণভূমিতে হস্তক্ষেপ সীমিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে; যাতে করে বাঘ-সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণের অস্বাভাবিক বাড়তি সংখ্যাধিক্য না ঘটে এবং ফলস্বরূপ বন্যপ্রাণীর সাথে স্থানীয় জনমানুষের মুখোমুখি হওয়ার মতো পরিস্থিতি ন্যূনতম করা যায়। পাশাপাশি টাইগার রিজার্ভের চারপাশ ঘিরে যে বাফার অঞ্চল থাকে, সেই এলাকাতেও হস্তক্ষেপ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়; যাতে তা বাঘের কোর বিচরণভূমির সঙ্গে পর্যাপ্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(৩) **কর্মসম্পাদন পদ্ধতির মান (Standard Operating Procedure বা SOP) :** 'জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘর্ষ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত তিনটি 'কর্মসম্পাদন পদ্ধতির মান' জারি করেছে—

(ক) প্রকৃতিবিরুদ্ধ নিয়মে মনুষ্য বসতিতে বাঘের আগমনের মতো আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা;

(খ) গবাদি পশুর ওপর বাঘের হানার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগ্রহণ;

(গ) টাইগার রিজার্ভের ধারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ তথা ব্যাঘ্র পুনর্বাসনের ওপর লাগাতার নজরদারি ও প্রয়োজনমাফিক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাগ্রহণ।

এই তিনটি 'কর্মসম্পাদন পদ্ধতির মান'-এর মূল উদ্দেশ্য টাইগার রিজার্ভের ধারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ তথা প্রয়োজনমাফিক ব্যাঘ্র পুনর্বাসন (যাতে তাদের সংখ্যা কোনও এক জায়গায় বেশি না বাড়ে বা সম্পদের ওপর টান না পড়ে), বাঘের হানা থেকে গবাদি পশু সুরক্ষিত রাখা যাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমানো যায়।

'ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংস্থা'-র সঙ্গে যৌথভাবে 'জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' "Eco-Friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife" শীর্ষক আরও একটি নথিও প্রকাশ করেছে। উদ্দেশ্য, পরিকাঠামো উন্নয়নের হাত থেকে এই করিডোর সুরক্ষিত রাখতে ভারতীয় রেল ট্রাফিক পরিষেবায় চাকুরীরত নবিশ ও রেলের ইঞ্জিনিয়ার, ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের মতো সংস্থাগুলিকে সচেতন করা।

২০১৬-'১৭, ২০১৭-'১৮ ও ২০১৮-'২৯ অর্থবর্ষে যথাক্রমে ৩৭০ কোটি টাকা, ৩৪৫ কোটি টাকা ও ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়; চলতি বছরে কেন্দ্র ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করেছে ৩৫০ কোটি টাকা।❑

(সূত্র : *প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরো*)

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

January, 2020
R.N.I. No. 19740/69

Celebrate Mahatma's 150th Birth Anniversary with our Gandhian Literature

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

For placing orders, please contact:

Ph : 033-2248-8030 / 2576 / 6696, e-mail : kolkatase.dpd@gmail.com

To buy online visit: www.bharatkosh.gov.in

e-version of select books available on Amazon and Google Play

website: www.publicationsdivision.nic.in

Follow us on @ DPD_India

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, কে. শ্যামা প্রসাদ কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।